

সাবা

৩৪

নামকরণ

১৫ আয়াতের বাক্য لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এটি এমন একটি সূরা যেখানে 'সাবা'-এর কথা বলা হয়েছে।

নাখিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়াজাত থেকে এর নাখিলের সঠিক সময়-কাল জানা যায় না। তবে বর্ণনাধারা থেকে অনুভূত হয়, সেটি ছিল মক্কার মাঝামাঝি যুগ অথবা প্রাথমিক যুগ। যদি মাঝামাঝি যুগ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত সেটি ছিল তার একেবারে প্রথম দিককার সময়। তখনো পর্যন্ত জুলুম-নিপীড়নের তীব্রতা দেখা দেয়নি এবং তখনো কেবলমাত্র ঠাট্টা-তামাশা, বিদূষ, গুজব ছড়ানো এবং মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দেবার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দমিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় কাফেরদের এমন সব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের এবং তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাংগ-বিদূষ ও অর্থহীন অপবাদের আকারে পেশ করতো। কোথাও এ আপত্তিগুলো উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে আবার কোথাও সেগুলো কোন্ আপত্তির জবাব তা স্বতচ্ছূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জবাব গুলো দেয়া হয়েছে বুঝাবার পদ্ধতিতে এবং আলোচনার মাধ্যমে শ্রবণ করিয়ে দেবার ও যুক্তিপ্ৰদর্শনের কায়দায়। কিন্তু কোথাও কোথাও কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতার খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ) ও সাবা জাতির কাহিনী এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমাদের সামনে ইতিহাসের এ দু'টি দৃষ্টান্তই রয়েছে : একদিকে রয়েছে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ)। আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন বিপুল শক্তি এবং এমন গৌরব দীপ্ত শান-শওকত, যা ইতিপূর্বে খুব কম লোককে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু পাওয়ার পরও তাঁরা অহংকার ও আত্মগুরিতায় লিপ্ত হননি। বরং নিজের রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিবর্তে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হন। অন্যদিকে ছিল সাবা জাতি। যখন আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত দান করলেন, তারা অহমিকায় ক্ষীণ হয়ে উঠলো এবং শেষে

এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো যে, এখন কেবল তাদের কাহিনীই দুনিয়ার বুকে রয়ে গেছে। এ দু'টি দৃষ্টান্ত সামনে রেখে স্বয়ং তোমাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তাওহীদ ও আখেরাতে বিশ্বাস এবং নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তা বেশী ভালো, না সেই জীবন বেশী ভালো যা গড়ে ওঠে কুফর ও শিরক এবং আখেরাত অস্বীকার ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে।

আয়াত ৫৪

সূরা সাবা-মক্কী

রুকু' ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ
 فِي الْآخِرَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
 وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ
 وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ② وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ
 بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۖ عِلْمُ الْغَيْبِ ۖ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
 فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي
 كِتَابٍ مُبِينٍ ③

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক^১ এবং আখেরাতে প্রশংসা তাঁর জন্য।^২ তিনি বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।^৩ যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বের হয়, যা কিছু আকাশ থেকে নামে এবং যা কিছু তাতে উঠিত হয় প্রত্যেকটি জিনিস তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।^৪

অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার কিয়ামত আমাদের ওপর আসছে না কেন^৫ বলো, আমার অদৃশ্য জ্ঞানী পরওয়ারদিগারের কসম, তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে।^৬ তাঁর কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোন জিনিস আকাশসমূহেও লুকিয়ে নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক, — সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।^৭

১. মূলে 'হাম্দ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এখানে এ দু'টি অর্থই প্রযুক্ত। আল্লাহ যখন

বিশ্ব-জাহান ও এর সমস্ত জিনিসের মালিক তখন অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানে সৌন্দর্য, পূর্ণতা, জ্ঞান, শক্তি, শিল্পকারিতা ও কারিগরির যে শোভা দৃষ্টিগোচর হয় এসবের জন্য একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। আর এ বিশ্ব-জাহানে বসবাসকারী যে কেউ যে কোন জিনিস থেকে লাভবান হচ্ছে বা আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করছে সে জন্য তার আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অন্য কেউ যখন এসব জিনিসের মালিকানায় শরীক নেই তখন প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা লাভ করার অধিকারও অন্য কারো নেই।

২. অর্থাৎ যেভাবে এ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তিনিই দান করেছেন, ঠিক তেমনি আখেরাতেও মানুষ যা কিছু পাবে তা তাঁরই ভাণ্ডার থেকে এবং তাঁরই দান হিসেবেই পাবে। তাই সেখানেও একমাত্র তিনিই হবেন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী।

৩. অর্থাৎ তাঁর সমস্ত কাজই হয় পূর্ণজ্ঞান ও প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তিনি যা করেন একদম ঠিকই করেন। নিজের প্রত্যেকটি সৃষ্টি কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, তার প্রয়োজন কি, তার প্রয়োজনের জন্য কি উপযোগী, এ পর্যন্ত সে কি করেছে এবং সামনের দিকে আরো কি করবে—এসব সম্পর্কে তিনি পূর্ণজ্ঞান রাখেন। নিজের তৈরি দুনিয়া সম্পর্কে তিনি বেখর নন বরং প্রতিটি অণু-পরমাণুর অবস্থাও তিনি পুরোপুরি জানেন।

৪. অর্থাৎ তাঁর রাজ্যে কোন ব্যক্তি বা দল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও যদি পাকড়াও না হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় নৈরাজ্য চলছে এবং আল্লাহ এখানকার ক্ষমতাহীন রাজা। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ করুণাশীল এবং ক্ষমা করাই তাঁর অভ্যাস। পাপী ও অপরাধীকে অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই পাকড়াও করা, তার রিয়িক বন্ধ করে দেয়া, তার শরীর অবশ করে দেয়া, মুহূর্তের মধ্যে তাকে মেরে ফেলা, সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কিন্তু তিনি এমনটি করেন না। তাঁর করুণাগুণের দাবী অনুযায়ী তিনি এটি করেন। সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নাফরমান বান্দাদেরকে টিল দিয়ে থাকেন। তাদেরকে আপন আচরণ শুধরে নেবার অবকাশ দেন এবং নাফরমানি থেকে বিরত হবার সাথেসাথেই মাফ করে দেন।

৫. ঠাট্টা-মস্করা করে চিবিয়ে চিবিয়ে তারা একথা বলে। তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, বহুদিন থেকে এ পয়গম্বর সাহেব কিয়ামতের আগমনী সংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জানি না আসতে আসতে তা আবার থেমে গেলো কোথায়। আমরা তার প্রতি এতই মিথ্যা আরোপ করলাম, এত গোস্তাখী করলাম, তা নিয়ে এত ঠাট্টা-বিদূপ করলাম কিন্তু এরপরও সেই কিয়ামত কোনভাবেই আসছে না।

৬. পরওয়ারদিগারের কসম খেয়ে তাঁর জন্য “অদৃশ্য জ্ঞানী” বিশেষণ ব্যবহার করার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন তো অবধারিত কিন্তু তার আগমনের সময় অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ বিষয়টিই কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ১৮৭, তা-হা ১৫, নূরমান ৩৪, আল আহযাব ৬৩, আল মূলক ২৫-২৬ এবং আন নাযি'আত ৪২-৪৪ আয়াত।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑧ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْيَمِّ ⑨ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ
 أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑩
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْتِيكُمْ إِذَا مَرَّ قَتَمَرٌ كُلِّ
 مَرَّزٍ ۖ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑪ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ
 جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ⑫

আর এ কিয়ামত এ জন্য আসবে যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিয়ক। আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।^৮ হে নবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়।^৯

অস্বীকারকারীরা লোকদেরকে বললো, “আমরা বলবো তোমাদেরকে এমন লোকের কথা যে এই মর্মে খবর দেয় যে, যখন তোমাদের শরীরের প্রতিটি অণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে, নাজানি এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা তৈরি করে, নাকি তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে।”^{১০}

না, বরং যারা আখেরাত মানে না তারা শাস্তি লাভ করবে এবং তারাই রয়েছে ঘোরতর ভ্রষ্টতার মধ্যে।^{১১}

৭. আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় এটি তার অন্যতম। যেমন সামনের দিকে ৭ আয়াতে আসছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেসব কারণে মৃত্যুপরের জীবনকে যুক্তি বিরোধী মনে করতো তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে, যখন সমস্ত মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তাদের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলোও চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন এ অসংখ্য অংশের আবার কিভাবে একত্র হওয়া সম্ভব

হবে এবং এগুলোকে এক সাথে জুড়ে আবার কেমন করে তাদেরকে সেই একই দেহাবয়বে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। একথা বলে এ সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে যে, আল্লাহর দণ্ডেরে এসব লিখিত আছে এবং আল্লাহ জানেন কোন্ জিনিসটি কোথায় গেছে। যখন তিনি পুনর্বাস সৃষ্টি করার সংকল্প করবেন তখন তাঁর পক্ষে প্রতিটি ব্যক্তির দেহের অংশগুলো একত্র করা মোটেই কষ্টকর হবে না।

৮. ওপরে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করা হয়েছিল এবং এখানে তার অপরিহার্যতার যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সময় অবশ্যই আসা উচিত যখন জ্বালমদেরকে তাদের জলুমের এবং সংকর্মশীলদেরকে তাদের সংকাজের প্রতিদান দেয়া হবে। যে সংকাজ করবে সে পুরস্কার পাবে এবং যে খারাপ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এটা চায় এবং এটা ইনসাফেরও দাবী। এখন যদি তোমরা দেখো, বর্তমান জীবনে প্রত্যেকটি অসৎলোক তার অসৎকাজের পুরোপুরি সাজা পাচ্ছে না এবং প্রত্যেকটি সৎলোক তার সৎকাজের যথার্থ পুরস্কার লাভ করছে না বরং অনেক সময় অসৎকাজ ও সৎকাজের উল্টো ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে তোমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও ইনসাফের এ অপরিহার্য দাবী একদিন অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। সেই দিনের নামই হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। তার আসা নয় বরং না আসাই বিবেক ও ইনসাফের বিরোধী।

এ প্রসঙ্গে ওপরের আয়াত থেকে আর একটি বিষয়ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে, ইমান ও সৎকাজের ফল হচ্ছে গোনাহের মার্জনা ও সম্মানজনক রিযিক লাভ এবং যারা আল্লাহর দীনকে হেয় করার জন্য বিদ্রিষ্ট ও শত্রুতামূলক প্রচেষ্টা চালাবে তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এ থেকে আপনা আপনিই একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাক্ষা দিলে যে ব্যক্তি ইমান আনবে তার কাজের মধ্যে যদি কিছু গলদও থাকে তাহলে সে সম্মানজনক রিযিক না পেয়ে থাকলেও মাগফিরাত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে না। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে কিন্তু আল্লাহর সত্য দীনের মোকাবিলায় বিদ্রোহমূলক ও বৈরী নীতি অবলম্বন করবে না সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না ঠিকই কিন্তু নিকৃষ্টতম শাস্তি তার জন্য নয়।

৯. অর্থাৎ এ বিরোধীরা তোমার উপস্থাপিত সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যতই জোর দিক না কেন তাদের এসব প্রচেষ্টা ও কৌশল সফলকাম হতে পারবে না। কারণ এসব কথার মাধ্যমে তারা কেবলমাত্র মূর্খদেরকেই প্রতারিত করতে পারবে। জ্ঞানবানরা তাদের প্রতারণাজালে পা দেবে না।

১০. কুরাইশ সরদাররা একথা ভালোভাবে জানতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যুক বলে মেনে নেয়া জনগণের জন্য ছিল বড়ই কঠিন। কারণ সমগ্র জাতি তাঁকে সত্যবাদী জানতো এবং সারা জীবনেও কখনো কেউ তাঁর মুখ থেকে একটি মিথ্যে কথা শোনেনি। তাই তারা লোকদের সামনে তাঁর প্রতি এভাবে দোষারোপ করতোঃ এ ব্যক্তি যখন মৃত্যু পরের জীবনের মতো অবাস্তব কথা মুখে উচ্চারণ করে চলেছে, তখন হয় সে (নাউযুবিল্লাহ) জেনে বুঝে একটি মিথ্যে কথা বলছে নয়তো সে পাগল। কিন্তু এ পাগল কথাটিও ছিল মিথ্যুক কথাটির মতই সমান ভিত্তিহীন ও উদ্ভট। কারণ একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বলা কেবল একজন নিরেট মূর্খ ও নির্বোধ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ نَّشَأَنَ خَشِيفٍ بِحَرِّ الْأَرْضِ ۚ أَوَسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا
مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

তারা কি কখনো এ আকাশ ও পৃথিবী দেখেনি যা তাদেরকে সামনে ও পেছন থেকে ঘিরে রেখেছে? আমি চাইলে তাদেরকে যমীনে ধসিয়ে দিতে অথবা আকাশের কিছু অংশ তাদের ওপর নিক্ষেপ করতে পারি।^{১২} আসলে তার মধ্যে রয়েছে একটি নির্দশন এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য যে আল্লাহ অভিমুখী হয়।^{১৩}

ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। নয়তো চোখে দেখেইবা এক ব্যক্তি একটি জ্যাস্ত মাছি গিলে খেয়ে নিতো কেমন করে। এ কারণেই আল্লাহ এ ধরনের বাজে কথার জবাবে কোন প্রকার যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং তারা মৃত্যুপরের জীবন সম্পর্কে যে বিষয় প্রকাশ করতো কেবলমাত্র তা নিয়েই কথা বলেছেন।

১১. এ হচ্ছে তাদের কথার প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, মূর্খের দল! তোমরা তো বিবেক বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসেছ। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাচ্ছে তার কথা মেনে নিচ্ছে না এবং সোজা যে পথটি জাহান্নামের দিকে চলে গেছে সেদিকেই চোখ বন্ধ করে দৌড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তারপরও তোমাদের নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বাঁচবার চিন্তা করছে উল্টা তাকেই তোমরা পাগল আখ্যায়িত করছো।

১২. এটা তাদের কথার দ্বিতীয় জবাব। এ জবাবটি অনুধাবন করতে হলে এ সত্যটি দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে যে, কুরাইশ কাফেররা যেসব কারণে মৃত্যুপরের জীবনকে অস্বীকার করতো তার মধ্যে তিনটি জিনিস ছিল সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট। এক, তারা আল্লাহর হিসেব-নিকেশ এবং তাঁর কাছে জবাবদিহির ব্যাপারটি মেনে নিতে চাইতো না। কারণ এটা মেনে নিলে দুনিয়ায় তাদের ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা থাকতো না। দুই, তারা কিয়ামত হওয়া, বিশ্ব ব্যবস্থায় ওলট পালট হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় একটি নবতর বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটাকে অকল্পনীয় মনে করতো। তিন, যারা শত শত হাজার হাজার বছর আগে মরে গেছে এবং যাদের হাড়গুলোও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে, বাতাসে ও পানিতে মিশে গেছে তাদের পুনর্বীর প্রাণ নিয়ে সশরীরে বেঁচে ওঠা তাদের কাছে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার মনে হতো। ওপরের জবাবটি এ তিনটি দিককেই পরিবেষ্টন করেছে এবং এ ছাড়াও এর মধ্যে একটি কঠোর সতর্কবাণীও নিহিত রয়েছে। এ ছোট ছোট বাক্যগুলোর মধ্যে যে বিষয়বস্তু লুকিয়ে রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

এক : যদি তোমরা কখনো চোখ মেলে এ পৃথিবী ও আকাশের দিকে তাকাতো তাহলে দেখতে পেতে এসব খেলনা নয় এবং এ ব্যবস্থা ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এ

বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস একথা প্রকাশ করছে যে, একটি সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তা পূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তাকে তৈরি করেছেন। এ ধরনের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অধীনে এখানে কাউকে বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি ও স্বাধীন ক্ষমতা দান করার পর তাকে অদায়িত্বশীল ও কারো কাছে কোনপ্রকার জবাবদিহি না করে এমনি ছেড়ে দেয়া যেতে পারে বলে ধারণা করা একেবারেই অযৌক্তিক ও অর্থহীন কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুই : গভীর দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে কিয়ামতের আগমন যে মোটেই কোন কঠিন ব্যাপার নয়, সে কথা যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে। পৃথিবী ও আকাশ যেসব নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সামান্য একটু হেরফের হলে কিয়ামত ঘটে যেতে পারে। আর এ ব্যবস্থাই আবার একধারও সাক্ষ্য দেয় যে, যিনি আজ এ দুনিয়া-জাহান তৈরি করে রেখেছেন তিনি আবার অন্য একটি দুনিয়াও তৈরি করতে পারেন। এ কাজ যদি তাঁর জন্য কঠিন হতো তাহলে এ দুনিয়াটিই বা কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করতো।

তিন : তোমরা পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকে কী মনে করছো? তাঁকে তোমরা মৃত মানব গোষ্ঠীকে পুনর্বীর সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে মনে করছো? যারা মরে যায় তাদের দেহ পচে খসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যতই দূরে ছড়িয়ে পড়ুক না কেন সেগুলো থাকে তো এ আকাশ ও পৃথিবীর সীমানার মধ্যেই। এর বাইরে তো চলে যায় না। তাহলে এ পৃথিবী ও আকাশ যে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন রয়েছে তাঁর পক্ষে মাটি, পানি ও হাওয়ার মধ্যে সেখানে যে জিনিস প্রবেশ করে আছে সেখান থেকে তাকে টেনে বের করে আনা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার। তোমাদের শরীরের মধ্যে এখন যা কিছু আছে, তাও তো তাঁরই একত্রিত করা এবং ঐ একই মাটি, পানি ও হাওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। এ বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সংগ্রহ করা যদি আজ সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে আগামীকাল কেন অসম্ভব হবে?

এ তিনটি যুক্তিসহ এ বক্তব্যের মধ্যে আরো যে সতর্কবাণী নিহিত রয়েছে, তা এই যে, তোমরা সব দিক থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আবেষ্টনীতে ঘেরাও হয়ে আছো। যেখানেই যাবে এ বিশ্ব-জাহান তোমাদের ঘিরে রাখবে। আল্লাহর মোকাবিলায় কোন আশ্রয়স্থল তোমরা পাবে না। অন্যদিকে আল্লাহর ক্ষমতা এতই অসীম যে, যখনই তিনি চান তোমাদের পায়ের তলদেশ বা মাথার ওপর থেকে যে কোন বিপদ আপদ তোমাদের প্রতি বর্ষণ করতে পারেন। যে ভূমিকে মায়ের কোলের মতো প্রশান্তির আধার হিসেবে পেয়ে তোমরা সেখানে গৃহ নির্মাণ করে থাকো, তার উপরিভাগের নীচে কেমন সব শক্তি কাজ করছে এবং কখন তিনি কোন্ ভূমিকম্পের মাধ্যমে এ ভূমিকে তোমাদের জন্য কবরে পরিণত করবেন তা তোমরা জানো না। যে আকাশের নিচে তোমরা এমন নিশ্চিন্তে চলাফেরা করছো যেন এটা তোমাদের নিজেদের ঘরের ছাদ, তোমরা জানো না এ আকাশ থেকে কখন কোন্ বিজলী নেমে আসবে অথবা কোন্ প্রলয়ংকর বর্ষার ঢল নামবে কিংবা কোন্ আকস্মিক বিপদ তোমাদের ওপর আপতিত হবে। এ অবস্থায় তোমাদের এ আল্লাহকে ভয় না করা, পরকালের ভাবনা থেকে এভাবে গাফেল হয়ে যাওয়া এবং একজন শুভাকাংখীর উপদেশের মোকাবিলায় এ মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়ার এ ছাড়া আর কি অর্থ হতে পারে যে, তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছো।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يُجِبَالٌ أَوْ يَبِى مَعَهُ وَالطَّيْرُ
وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۖ أَنْ أَعْمَلْ سِغَاتٍ وَقَدْ رَفِى السَّرْدَ وَأَعْمَلُوا
صَالِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২ রুকু'

দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে বিরাট অনুগ্রহ দান করেছিলাম।^{১৪} (আমি হুকুম দিলাম) হে পর্বতমালা! এর সাথে একাত্মতা করো (এবং এ হুকুমটি আমি) পাখিদেরকে দিয়েছি।^{১৫} আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি এ নির্দেশ সহকারে যে, বর্ম নির্মাণ করো এবং তাদের পরিমাপ যথার্থ আন্দাজ অনুযায়ী রাখো।^{১৬} (হে দাউদের পরিবার!) সৎকাজ করো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আমি দেখছি।

১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ধরনের বিদ্বেষ ও অন্ধ স্বার্থপ্রীতি দৃষ্ট নয়, যার মধ্যে কোন জিদ ও হঠকারিতা নেই বরং যে আন্তরিকতা সহকারে তার মহান প্রতিপালকের কাছে পথনির্দেশনার প্রত্যাশী হয়, সে তো আকাশ ও পৃথিবীর এ ব্যবস্থা দেখে বড় রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যার মন আল্লাহর প্রতি বিমুখ সে বিশ্ব-জ্ঞাহানে সবকিছু দেখবে তবে প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিতকারী কোন নিদর্শন সে অনুভব করবে না।

১৪. মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি যে অসংখ্য অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বাইতুল লাহমের ইয়াহদা গোত্রের একজন সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জালুতের মতো এক বিশাল দেহী ভয়ংকর শত্রুকে হত্যা করে তিনি রাতারাতি বনী ইসরাঈলের নয়নমণিতে পরিণত হন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর উত্থান শুরু হয়। এমনকি তালুতের ইত্তিকালের পরে প্রথমে তাঁকে 'হাবরুনে' (বর্তমান আল খালীল) ইয়াহদিয়ার শাসনকর্তা করা হয়। এর কয়েক বছর পর সকল বনী ইসরাঈল গোত্র সর্বসম্মতভাবে তাঁকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করে এবং তিনি জেরুসালেম জয় করে ইসরাঈলী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাৎ নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসায়ফ, ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীলতা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ, ২৭৩ টীকা এবং বনী ইসরাঈল, ৭ টীকা)

১৫. এর আগে এ বিষয়টি সূরা আযিযার ৭৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আযিয়া, ৭১ টীকা)

وَلِسُلَيْمِ الرِّيحِ غَدَ وَهَا شَهْرُ وَرَوَاحِهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ
 وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَن
 أَمْرِنَا نَذِيرٌ لَهُ مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّكَارِيِبَ
 وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّسِيَّتٍ ۖ اِعْمَلُوا آلَ
 دَاوُدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝

আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে বশীভূত করে দিয়েছি, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।^{১৭} আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করি।^{১৮} এবং এমন সব জিনকে তার অধীন করে দিয়েছে যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো।^{১৯} তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করে তাকে আমি আবাদন করাই জলন্ত আগুনের স্বাদ। তারা তার জন্য তৈরি করতো যা কিছু সে চাইতো, উঁচু উঁচু ইमारত, ছবি,^{২০} বড় বড় পুকুর সদৃশ থালা এবং অনড় বৃহদাকার ডেগসমূহ।^{২১} —হে দাউদের পরিবার! কাজ করো কৃতজ্ঞতার পদ্ধতিতে।^{২২} আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।

১৬. এ বিষয়টিও সূরা আযিয়ার ৮০ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে এর ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল আযিয়া, ৭২ টাকা)

১৭. এ বিষয়টিও সূরা আযিয়ার ৮১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেখানে তার ব্যাখ্যাও করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আযিয়া ৭৪-৭৫ টাকা)

১৮. কোন কোন প্রাচীন তাফসীরকার এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, ভূগর্ভ থেকে হযরত সুলাইমানের জন্য একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে পানির পরিবর্তে গলিত তামা প্রবাহিত হতো। কিন্তু আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমলে তামা গলাবার এবং তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরি করার কাজ এত ব্যাপক আকারে চলতো যেন মনে হতো সেখানে তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আযিয়া, ৭৪-৭৫ টাকা)

১৯. যেসব জিনকে হযরত সুলাইমানের অধীন করে দেয়া হয়েছিল তারা গ্রামীণ ও পাহাড় পর্বতে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী ছিল, না সত্যিকার জিন ছিল, যারা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে একটি অদৃশ্য সৃষ্টি হিসেবে পরিচিত—সে ব্যাপারে সূরা আযিয়া ও সূরা

নামলের ব্যাখ্যায় আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আযিয়া, ৭৫ এবং আন নামল, ২৩, ৪৫ ও ৫২ টীকা)

২০. মূলে تمثيل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এটি تمثال শব্দের বহুবচন। আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসের মতো করে তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিসকে আরবীতে বলে। এসব জিনিস মানুষ, পশু, গাছ, ফুল, নদী বা অন্য যে কোন নিষ্প্রাণ জিনিসও হতে পারে।

التمثال اسم للشئ المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله
(لسان العرب)

“এমন প্রত্যেকটি কৃত্রিম জিনিসকে তিমসাল বলা হয় যা আল্লাহর তৈরি করা জিনিসের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।”

التمثال كل ما صور على صورة غيره من حيوان وغير حيوان -

“এমন প্রত্যেকটি ছবিকে তিমসাল বলা হয়, যা অন্য কোন জিনিসের আকৃতি অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, তা সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ যাই হোক না কেন।” (তাফসীরে কাশাফ)

এ কারণে কুরআন মজীদের এ বর্ণনা থেকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্য যে ছবি তৈরি করা হতো তা মানুষের ও প্রাণীর ছবি অথবা তাদের ভাস্কর মূর্তি হওয়াটা অপরিহার্য ছিল না। হতে পারে হযরত সুলাইমান (আ) নিজের ইমারতগুলো যেসব ফুল, পাতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কারুকাজে শোভিত করেছিলেন সেগুলোকেই তামাসীল বলা হয়েছে।

হযরত সুলাইমান (আ) ফেরেশতা ও নবীদের ছবি অংকন করিয়েছিলেন, কোন কোন মুফাসসিরের এ ধরনের বক্তব্যই বিভ্রান্তির উদগাতা। বনী ইসরাঈলের পৌরাণিক বর্ণনাবলী থেকে তাঁরা একথা সংগ্রহ করেন এবং তারপর এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, পূর্ববর্তী শরীয়াতগুলোতে এ ধরনের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু কোন প্রকার অনুসন্ধান না করে এ বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করার সময় এ মনীষীবৃন্দ একথা চিন্তা করেননি যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে মূসার শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন সেখানেও শরীয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) মতো মানুষের ও প্রাণীর ছবি ও মূর্তি নির্মাণ একই পর্যায়ে হারাম ছিল। আর তাঁরা একথাও ভুলে যান যে, বনী ইসরাঈলের একটি দলের তাঁর সাথে শত্রুতা ছিল এবং এরি বশবর্তী হয়ে তারা শিরক, মূর্তি পূজা ও ব্যভিচারের নিকৃষ্টতম অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করে। তাই তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে এ মহিমাম্বিত পয়গম্বর সম্পর্কে এমন কোন কথা কোন ক্রমেই মেনে নেয়া উচিত নয় যা আল্লাহ প্রেরিত কোন শরীয়াতের বিরুদ্ধে চলে যায়। একথা সবাই জানেন, হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের পরে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বনী ইসরাঈলে যত নবীই এসেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন তাওরাতের অনুসারী। তাঁদের একজনও এমন কোন শরীয়াত আনেননি যা তাওরাতের আইন রদ করে দেয়। এখন তাওরাতের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেখানে মানুষ ও পশুর ছবি ও মূর্তি নির্মাণকে বারবার একেবারেই হারাম বলে ঘোষণা করা হচ্ছেঃ

“তুমি আপনার নিমিষ্টে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না।” (যাত্রা পুস্তক ২০ : ৪)

“তোমরা আপনাদের জন্য অবস্থ প্রতিমা নির্মাণ করিও না, না ক্ষোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিবার নিমিষ্টে তোমাদের দেশে কোন ক্ষোদিত প্রস্তর রাখিও না।” (লেবীয় পুস্তক ২৬ : ১)

“পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্তিতে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্মাণ কর, পাছে পুরুষের বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষীর প্রতিকৃতি, ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, অথবা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি নির্মাণ কর।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৪ : ১৬-১৮)

“যে ব্যক্তি কোন ক্ষোদিত কিম্বা ছাচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু, শিল্পকরের হস্তনির্মিত বস্তু নির্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত।” (দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ : ১৫)

এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট বিধানের পর কেমন করে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আ) জিনদের সাহায্যে নবী ও ফেরেশতাদের ছবি বা তাদের প্রতিমা তৈরি করার কাজ করে থাকবেন। আর যেসব ইহুদি হযরত সুলাইমানের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতো যে, তিনি নিজের মুশরিকা স্ত্রীদের প্রেমে বিভোর হয়ে মূর্তি পূজা করতে শুরু করেছিলেন, তাদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে একথা কেমন করে মেনে নেয়া যায়। (দেখুন বাইবেলের রাজাবলী—১, ১১ অধ্যায়)

তবুও মুফাস্সিরগণ বনী ইসরাইলের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করার সাথে সাথে একথাও সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতে এটি হারাম। তাই এখন হযরত সুলাইমানের (আ) অনুসরণ করে ছবি ও ভাস্কর মূর্তি নির্মাণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু লোক পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণকে হালাল করতে চান। তাঁরা কুরআন মজীদদের এ আয়াতকে নিজেদের জন্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা বলেন, একজন নবী যখন এ কাজ করেছেন এবং আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর কিতাবে একথা আলোচনা করেছেন এবং এর ওপর তাঁর কোন প্রকার অপছন্দনীয়তার কথা প্রকাশ করেননি তখন অবশ্যই তা হালাল হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এসব অন্ধ অনুসারীর এ যুক্তি দু’টি কারণে ভুল। প্রথমত কুরআনে এই যে, “তামাসীল” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ থেকে সুস্পষ্টভাবে মানুষ ও পশুর ছবির অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এ থেকে নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবিও বুঝা যায়। তাই নিছক এ শব্দটির ওপর ভিত্তি করে কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের ও পশুর ছবি হালাল এ বিধান দেয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী সনদযুক্ত মুতাওয়াতিহ হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণী জাতীয় যে কোন জিনিসের ছবি নির্মাণ ও সংরক্ষণকে অকাট্যভাবে ও চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ

প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) থেকে যেসব উক্তি প্রমাণিত হয়েছে এবং সাহাবীগণ থেকে যেসব বাণী ও কর্ম উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করছি :

(১) عن عائشة ام المؤمنين ان ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة (بخارى ، كتاب الصلوة - مسلم ، كتاب المساجد ، نسائي ، كتاب المساجد)

“উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা দেখেছিলেন, তাতে ছবি ছিল। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলেন। নবী (সা) বলেন, তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সৎলোকের জন্য হতো, তার মৃত্যুর পর তার কবরের ওপর তারা একটি উপাসনালয় তৈরি করতো এবং তার মধ্যে এ ছবিগুলো তৈরি করতো। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে।”

(২) عن ابى حنيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصور -

“আবু হজাঈফা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিত্রকর্মের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।” (বুখারী : ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়, তালাক অধ্যায়, পোশাক অধ্যায়)

(৩) عن ابى زرة قال دخلت مع ابى هريرة دارا بالمدينة فرأى اعلامها مصورا يصور ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة -

“আবু যুর'আহ বলেন, একবার আমি হযরত আবু হুরাইরার (রা) সাথে মদীনার একটি গৃহে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, গৃহের ওপর দিকে একজন চিত্রকর চিত্র নির্মাণ করছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন, তার চেয়ে বড় জ্বালেম তার কে হবে যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে! তারা একটি শস্যদানা অথবা একটি পিপড়ে বানিয়ে দেখাক তো।” (বুখারী : পোশাক অধ্যায়, মুসনাদে আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় পরিষ্কার উল্লেখিত হয়েছে, এটি ছিল মারওয়ানের গৃহ)

(৬) عن ابي محمد الهذلي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا الا كسره ولا قبراً الا سواه ولا صورة الا لطحها ، فقال رجل انا يا رسول الله فانطلق فهاب اهل المدينة - فرجع - فقال علي انا انطلق يا رسول الله - قال فانطلق ، فانطلق ثم رجع - فقال يا رسول الله لم ادع بها وثنا الا كسرته ولا قبراً الا سويته ولا صورة الا لطحها - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لصنعة شئ من هذا فقد كفر بما انزل على محمد -

আবু মুহাম্মাদ হাযালী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে মদীনায গিয়ে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে। সকল কবর ভূমির সমান করে দেবে এবং সকল ছবি নিশ্চিহ্ন করে দেবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এ জন্য প্রস্তুত। কাজেই সে গেলো কিন্তু মদীনাবাসীদের ভয়ে এ কাজ না করেই ফিরে এলো। তখন হযরত আলী (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যাই? নবী করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও। হযরত আলী (রা) গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আমি কোন মূর্তি না ভেঙ্গে কোন কবর ভূমির সমান না করে এবং কোন ছবি নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়িনি। একথায় নবী করীম (সা) বললেন, এখন যদি কোন ব্যক্তি এ জাতীয় কোন জিনিস তৈরি করে তাহলে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম : জানাযাহ অধ্যায় এবং নাসাঈ, জানাযাহ অধ্যায়েও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে)

(৫) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافع -

“ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,আর যে ব্যক্তি ছবি অংকন করলো তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাকে বাধ্য

করা হবে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য। কিন্তু সে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (বুখারী, তাকসীর অধ্যায়; তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(৬) عن سعيد ابن ابى الحسن قال كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس انى انسان انما معيشتى من صنعة يدى وانى اصنع هذه التصاوير - فقال ابن عباس لا احثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافع فيها ابدا - فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه - فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شئى ليس فيه روح -

“সাদ্দি ইবনে আবুল হাসান বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এলো এবং সে বললো, হে আবু আব্বাস! আমি এমন এক ব্যক্তি যে নিজের হাতে রোজগার করে এবং এ ছবি তৈরি করেই আমি রোজগার করি। ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছি তোমাকেও তাই বলবো। আমি নবী করীম (সা) থেকে একথা শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন এবং যতক্ষণ সে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার না করবে ততক্ষণ তাকে রেহাই দেবেন না। আর সে কখনো তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। একথা শুনে সে ব্যক্তি বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং তার চেহারা হলুদ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! যদি তোমার ছবি আঁকতেই হয়, তাহলে এই গাছের ছবি আঁকো অথবা এমন কোন জিনিসের ছবি আঁকো যার মধ্যে প্রাণ নেই।” (বুখারী, ব্যবসায় অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(৭) عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبی صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে চিত্রকরেরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(৪) عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا
ما خلقتم -

“আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা এ ছবি আঁকে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা কিছু তোমরা তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায় এবং মুসনাদে আহমাদ)

(৯) عن عائشة رضى الله عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاویر
فقام النبی صلى الله عليه وسلم بالباب ولم يدخل فقلت اتوب الى
الله مما اذ نبت قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها
قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا
ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة -

“হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি বালিশ কেনেন। তার গায়ে ছবি আঁকা ছিল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি দরোজায়ই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম, আমি এমন প্রত্যেকটি গোনাহ থেকে তাওবা করছি যা আমি করেছি। নবী করীম (সা) বললেন, এ বালিশটি কেন? বললাম, আপনি এখানে আসবেন এবং এর গায় হেলান দেবেন এ জন্য এটা এখানে রাখা হয়েছে। বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা কিছু তোমরা তৈরি করেছো তাকে জীবিত করো। আর ফেরেশতারা (রহমতের ফেরেশতারা) এমন কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়; মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়; ইবনে মাজাহ, ব্যবসায় অধ্যায়; মুআত্তা, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়)

(১০) عن عائشة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانا متستره بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه
ثم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق
الله -

“হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমি একটি পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তার গায়ে ছবি

আঁকা ছিল। তাঁর চেহারার রং বদলে গেলো। তারপর তিনি পর্দাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হবে তাদের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করার চেষ্টা যারা করে তারাও রয়েছে।” (মুসলিম, পোশাক অধ্যায়; বুখারী, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়)

(১১) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرَتْ عَلَى بَابِي دَرَنُوكَا فِيهِ الْخَيْلُ نَوَاتِ الْأَجْنَحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ -

“হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে ফিরে এলেন। তখন আমি আমার দরোজায় একটি পর্দা টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তার গায়ে পক্ষ বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি আঁকা ছিল। নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, এটি নামিয়ে ফেলো। আমি তা নামিয়ে ফেললাম।” (মুসলিম, পোশাক অধ্যায় এবং নাসাঈ, সৌন্দর্য অধ্যায়)

(১২) عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ -

“জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের মধ্যে ছবি রাখতে মানা করেছেন এবং ছবি আঁকতেও নিষেধ করেছেন।” (তিরমিযী, পোশাক অধ্যায়)

(১৩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ -

“ইবনে আব্বাস (রা) আবু তাল্হা আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতারা (অর্থাৎ রহমতের ফেরেশতারা) এমন কোন গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর পালিত থাকে এবং এমন কোন গৃহেও প্রবেশ করে না যেখানে ছবি থাকে।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়)

(১৪) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ أَنَا لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ -

“আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার জিব্রীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার ওয়াদা করেন কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যায় এবং তিনি আসেন না। নবী করীম (সা) এতে পেরেশান হন। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং তাঁকে পেয়ে যান। তিনি তাঁর কাছে অভিযোগ করেন। তাতে তিনি বলেন, আমরা এমন কোন গৃহে প্রবেশ করি না যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে।” (বুখারী, পোশাক অধ্যায়, এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মাদ বিভিন্ন সাহাবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন)

এসব হাদীসের মোকাবিলায় আরো কিছু হাদীস এমন পেশ করা হয় যেগুলোতে ছবির ব্যাপারে ছাড় পাওয়া যায়। যেমন আবু তাল্হা আনসারীর এ হাদীস : যে কাপড়ে ছবি উৎকীর্ণ থাকে তা দিয়ে পর্দা তৈরি করে টানিয়ে দেবার অনুমতি আছে। (বুখারী, পোশাক অধ্যায়) হযরত আয়েশার (রা) এ বর্ণনা : ছবিযুক্ত কাপড় ছিড়ে যখন তিনি তা দিয়ে তোষক বা গদি বানিয়ে নেন তখন নবী করীম (সা) তা বিছাতে নিষেধ করেননি। (মুসলিম, পোশাক অধ্যায়) সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) এ হাদীস : প্রকাশ্য স্থানে যে ছবি টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ, ছবি সম্বলিত যে কাপড় বিছানায় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে তা নিষিদ্ধ নয়। (মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীসও ওপরে উদ্ধৃত হাদীসগুলো খণ্ডন করে না। ছবি অংকন করার বৈধতা এর মধ্য থেকে কোন একটি হাদীস থেকেও পাওয়া যায় না। এ হাদীসগুলোতে যদি কোন কাপড়ের গায়ে ছবি অঙ্কিত থাকে এবং তা কিনে নেয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে কেবলমাত্র সে কথাই আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে আবু তাল্হা আনসারীর বর্ণিত হাদীসটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি এমন বহু সহীহ হাদীসের পরিপন্থী যেগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি সম্বলিত কাপড় টানিয়ে দিতে কেবলমাত্র নিষেধই করেননি বরং তা ছিড়ে ফেলেছেন। তাছাড়া তিরমিযী ও মুআত্তায় হযরত আবু তাল্হার নিজের যে কার্যক্রম উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি ছবি সম্বলিত পর্দা ঝুলানো তো দূরের কথা এমন বিছানা বিছাতেও অপছন্দ করতেন যাতে ছবি আঁকা থাকতো। আর হযরত আয়েশা ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়াজাত সম্পর্কে বলা যায়, তা থেকে কেবলমাত্র এতটুকু বৈধতাই প্রকাশ পায় যে, ছবি যদি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে না থাকে বরং হীনভাবে বিছানায় রাখা থাকে এবং তাকে পদদলিত করা হয়, তাহলে তা সহনীয়। যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পকে মানব সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব গণ্য করে এবং তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত করতে চায় সার্বিকভাবে তার বৈধতা এ হাদীসগুলো থেকে কেমন করে প্রমাণ করা যেতে পারে?

ছবির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্তভাবে উম্মাতের জন্য যে বিধান রেখে গেছেন তার সন্ধান বর্ষীয়ান ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অনুসৃত কর্মনীতি থেকেই পাওয়া যায়। ইসলামে এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি যে, সমস্ত পর্যায়ক্রমিক বিধান ও প্রাথমিক উদারনীতির পর সর্বশেষে নবী করীম (সা) যে বিধান নির্ধারণ করেন সেটাই নির্ভরযোগ্য ইসলামী বিধান। আর নবী করীমের (সা) পর শ্রেষ্ঠ ও বর্ষীয়ান সাহাবীগণ কর্তৃক কোন পদ্ধতিকে কার্যকর করা একথারই প্রমাণ পেশ করে যে, নবী করীম (সা)

উম্মাতকে ঐ পদ্ধতির ওপরই রেখে গিয়েছিলেন। এবার দেখুন ছবির ব্যাপারে এই পবিত্র দলটির আচরণ কিরূপ ছিল :

قال عمر رضى الله عنه انا لا ندخل كنا نُسك من اجل التماثيل
التي فيها الصور (بخارى ، كتاب الصلوة)

“হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খৃষ্টানদের বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় প্রবেশ করবো না, কারণ তার মধ্যে ছবি রয়েছে।” (বুখারী, সালাত অধ্যায়)

كان ابن عباس يصلى فى بيعة الابيعة فيها تماثيل -

“ইবনে আব্বাস (রা) গীর্জায় নামায পড়ে নিতেন কিন্তু এমন কোন গীর্জায় পড়তেন না যার মধ্যে ছবি থাকতো।” (বুখারী, সালাত অধ্যায়)

عن ابى الهياج الاسدى ، قال لى على الا ابعثك على ما بعثنى
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع تماثالا الا طمسته
ولا قبراً مشرفاً الا سويته ولا صورة الا طمستها -

“আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, হযরত আলী (রা) আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন আমি কি তোমাকে সেখানে পাঠাবো না? আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি কোন মূর্তি না ভেঙে ছাড়বে না, কোন উচু কবর মাটির সমান না করে ছেড়ে দেবে না এবং কোন ছবি নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না।” (মুসলিম, জানাযাহ অধ্যায় এবং নাসাঈ, জানাযাহ অধ্যায়)

عن حنش الكنانى عن على انه بعث عامل شرطته فقال له ائدرى
على ما ابعثك ؟ على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان انحى كل صورة وان اسوى كل قبر -

“হান্শুল কিনানী বলেন, হযরত আলী (রা) তাঁর পুলিশ বিভাগের কোতায়ালকে বলেন, তুমি জানো আমি তোমাকে কোন অভিযানে পাঠাচ্ছি? এমন অভিযানে যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি ছবি নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং প্রত্যেকটি কবরকে জমির সাথে মিশিয়ে দাও।” (মুসনাদে আহমাদ)

এই প্রমাণিত ইসলামী বিধানকে ইসলামী ফকীহগণ মেনে নিয়েছেন এবং তাঁরা একে ইসলামী আইনের একটি ধারা গণ্য করেছেন। কাজেই আল্লামা বদরুদ্দীন ‘আইনী ‘তাওযীহ’-এর বরাত দিয়ে লিখছেন :

“আমাদের সহযোগীগণ (অর্থাৎ হানাফী ফকীহগণ) এবং অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, কোন জীবের ছবি আঁকা কেবল হারামই নয় বরং মারাত্মক পর্যায়ে হারাম এবং কবীরাহ গোনাহের অন্তরভুক্ত। অংকনকারী হয়প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা তৈরি করলেও সর্বাবস্থায় তা হারাম। কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে ছবি কাপড়ে, বিছানায়, দীনারে বা দিরহামে অথবা পয়সায় কিংবা কোন পাত্রে বা দেয়ালে যেখানেই অংকন করা হোক না কেন তা হারাম। তবে জীব ছাড়া অন্য কোন জিনিস যেমন গাছপালা ইত্যাদির ছবি অংকন করা হারাম নয়। এ সমস্ত ব্যাপারে ছবির ছায়াধারী হবার বা না হবার মধ্যে কোন ফারাক নেই। এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন ইমাম মালেক (র), ইমাম সুফিয়ান সগরী (র), ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য উলামা। কাযী ঈয়ায বলেন, ‘মেয়েদের খেলনা পুতুল এর আওতা বহির্ভূত। কিন্তু ইমাম মালেক (র) এগুলো কেনাও অপছন্দ করতেন।’ (উমদাতুল কারী, ২২ খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, এ অভিমতকেই ইমাম নববী মুসলিমের ব্যাখ্যায় আরো বেশী বিস্তারিত আকারে উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন শারহে নববী, মিসরে মুদ্রিত, ১৪ খণ্ড, ৮১-৮২ পৃষ্ঠা)

এতো গেলো ছবি আঁকা সম্পর্কিত বিধান। এখন থাকে অন্যের আঁকা চবি ব্যবহার করার বিষয়। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার অসকালানী মুসলিম ফকীহগণের অভিমত এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

“মালেকী ফকীহ ইবনে আরাবী বলেন, যে ছবির ছায়া পড়ে তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে তো ‘ইজম’ অনুষ্ঠিত হয়েছে—চাই তা অসম্মানজনকভাবে রাখা হোক বা না হোক। একমাত্র মেয়েদের খেলার পুতুল এ ইজমার বাইরে থাকে।.....ইবনে আরাবী একথাও বলেন, যে ছবির ছায়া হয় না তা যদি তার নিজের অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে (অর্থাৎ আয়নার প্রতিচ্ছায়ার মতো না হয় বরং ছাপানো ছবির মতো স্থায়ী ও অনড় হয়) তাহলে তাও হারাম—তাকে হীনতার সাথে রাখা হোক বা না হোক। তবে হাঁ, যদি তার মাথা কেটে দেয়া হয় অথবা তার অংশগুলো আলাদা করে দেয়া হয়, তাহলে তার ব্যবহার বৈধ।ইমামুল হারামাইন একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, পর্দা বা বালিশের ওপর যদি কোন ছবি আঁকা থাকে, তাহলে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে কিন্তু দেয়াল বা ছাদের গায়ে লাগানো ছবি অবৈধ। কারণ এ অবস্থায় ছবি মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে পর্দা ও বালিশে ছবি অসম্মানজনক অবস্থায় থাকবে।.....ইবনে আবী শাইবা ইকরামা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাব’ঈদের যুগের আলেমগণ এ অভিমত পোষণ করতেন যে, বিছানায় ও বালিশে ছবি থাকলে তা তাঁর জন্য লাঞ্ছনাকর হয়। তাছাড়া তাদের এ চিন্তাও ছিল যে, উঁচু জায়গায় যে ছবিই লাগানো হয় তা হারাম এবং পদতলে যাকে পিষ্ট করা হয় তা জায়েয। এ অভিমত ইবনে সীরীন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, ইকরামা ইবনে খালেদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।” (ফাতহুল বারী, ১০ খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা ভালোভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারটি কোন মতদ্বৈততামূলক বা সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়। বরং নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট উক্তি, সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা এবং মুসলিম ফকীহগণের সর্বসম্মত ফতোয়ার ভিত্তিতে এটি একটি স্বীকৃত আইন। বিদেশী ও বিজ্ঞাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভাবিত কিছু লোকের চুলচেরা অপব্যাখ্যা তাতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথাও অনুধাবন করতে হবে। এর ফলে আর কোন প্রকার বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না।

কেউ কেউ ফটো ও হাতে আঁকা ছবির মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেন। অথচ শরীয়াত ছবিকেই হারাম করেছে, ছবির কোন বিশেষ পদ্ধতিকে হারাম করেনি। ফটো ও হাতে আঁকা ছবির মধ্যে ছবি হবার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য তা কেবলমাত্র ছবি নির্মাণ পদ্ধতির দিক দিয়েই আছে এবং এদিক দিয়ে শরীয়াত স্বীয় বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি।

কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকেন, ইসলামে ছবি হারাম করা হয়েছিল শুধুমাত্র শিরক ও মূর্তিপূজা রোধ করার জন্য। আর এখন তার কোন ভয় নেই। কাজেই এখন এ নির্দেশ কার্যকর না থাকা উচিত। কিন্তু এ যুক্তি সঠিক নয়। প্রথমত হাদীসে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কেবলমাত্র শিরক মূর্তিপূজার বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ছবিকে হারাম করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ দাবীও একেবারেই ভিত্তিহীন যে, বর্তমানে দুনিয়ায় শিরক ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে। আজ এই উপমহাদেশেই কোটি কোটি মুশরিক ও মূর্তিপূজারী রয়ে গেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে শিরক হচ্ছে। খৃষ্টানদের মতো কিতাবধারীগণও আজ হযরত ইসা (আ), হযরত মারুয়াম (আ) ও তাদের বহু মনীষীর মূর্তি ও ছবির পূজা করছে। এমনকি মুসলমানদের একটি বড় অংশও সৃষ্টিপূজার বিপদ থেকে রেহাই পেতে পারেনি।

কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র মুশরিকী ধরনের ছবিগুলোই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এমনসব ব্যক্তির ছবি ও মূর্তি যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে নেয়া হয়েছে। ঘাদবাকি অন্যান্য ছবি ও মূর্তি হারাম হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এ ধরনের কথা যারা বলেন তারা আসলে শরীয়াত প্রণেতার উক্তি ও বিধান থেকে আইন আহরণ করার পরিবর্তে নিজেদের নিজেদের শরীয়াত প্রণেতা হয়ে বসেছেন। তারা জানেন না, ছবি কেবলমাত্র শিরক ও মূর্তিপূজার কারণ হয় না বরং দুনিয়ায় আরো অনেক ফিতনারও কারণ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। যেসব বড় বড় উপকরণের মাধ্যম রাজা বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব সাধারণ মানুষের মগজে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে ছবি তার অন্যতম। দুনিয়ায় অশ্লীলতা ও যৌনতার বিস্তারের জন্যও ছবিকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আজকের যুগে এ ফিতনাটি অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসরমান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন, বিপর্যয় ও দাংগা-হাংহামা সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষকে নানাতাবে বিভ্রান্ত করার জন্য ছবিকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয় এবং আজকের যুগে এর প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে বেশী। তাই শরীয়াত প্রণেতা কেবলমাত্র মূর্তিপূজা প্রতিরোধের জন্য ছবি হারাম হবার হুকুম দিয়েছেন, একথা মনে করা আসলেই ভুল। শরীয়াত প্রণেতা শর্তহীনভাবে জীবের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা নিজেরা যদি শরীয়াত প্রণেতা নই বরং শরীয়াত

প্রণেতার অনুসারী হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের শর্তহীনভাবে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে হকুমের কোন কার্যকারণ বের করে' সে দৃষ্টিতে কিছু ছবি হারাম এবং কিছু ছবি হালাল গণ্য করতে থাকবো, এটা আমাদের জন্য কোনক্রমেই বৈধ নয়।

কিছু লোক আপাত দৃষ্টিতে একেবারেই 'অক্ষতিকর ধরনের কতিপয় ছবির দিকে ইংগিত করে বলেন, এগুলোতে ক্ষতি কি? এগুলোতো শিরক, অশ্লীলতা বিপর্যয় সৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রচারণা এবং এমনি ধরনের অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত। এ ক্ষেত্রে এগুলোর নিষিদ্ধ হবার কারণ কি হতে পারে? এ ব্যাপারে লোকেরা আবার সেই একই ভুল করে অর্থাৎ প্রথমে হকুমের কার্যকারণ নিজেরা বের করে এবং তারপর প্রশ্ন করতে থাকে, যখন অমুক জিনিসের মধ্যে এ কার্যকারণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন তা নাজায়েয হবে কেন? এ ছাড়াও তারা ইসলামী শরীয়াতের এ নিয়মটিও বোঝে না যে, শরীয়াতে হালাল ও হারামের মধ্যে এমন কোন অস্পষ্ট সীমারেখা কায়ম করে না যা থেকে মানুষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না যে সে বৈধতার সীমার মধ্যে কতদূরে অবস্থান করছে এবং কোথায় এ সীমা অতিক্রম করে গেছে। বরং শরীয়াত এমন পার্থক্য রেখা টেনে দেয় যাকে প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মুক্ত দিবালোকের মতো প্রত্যক্ষ করতে পারে। জীবের ছবি হারাম এবং অজীবের ছবি হালাল— ছবির ব্যাপারে এ পার্থক্য রেখা পুরোপুরি সুস্পষ্ট। এ পার্থক্য রেখার মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি শরীয়াতের বিধান মেনে চলতে চায় তার জন্য কোন্ জিনিসটি হারাম এবং কোন্ জিনিসটি হালাল তা সে পরিষ্কারভাবে জানতে পারে। কিন্তু জীবের ছবির মধ্যে যদি কোনটিকে জায়েয ও কোনটিকে নাজায়েয গণ্য করা হয় তাহলে উভয় ধরনের ছবির বৃহত্তর তালিকা দিয়ে দেবার পরও বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখা কোনদিনও সুস্পষ্ট হতে পারে না এবং অসংখ্য ছবি এমন থেকে যাবে যেগুলোকে বৈধতার সীমারেখার মধ্যে না বাইরে মনে করা হবে সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাবে। এ ব্যাপারটি ঠিক তেমনি যেমন মদের ব্যাপারে ইসলামের হকুম হচ্ছে এ থেকে একেবারেই দূরে অবস্থান করতে হবে। এটি এ ব্যাপারে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু যদি বলা হয়, এর এমন একটি পরিমাণ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা উচিত যার ফলে নেশার সৃষ্টি হয়, তাহলে হালাল ও হারামের মধ্যে কোন জায়গায়ও পার্থক্য রেখা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারবে না এবং কি পরিমাণ মদ পান করা যাবে এবং কোথায় গিয়ে থেমে যেতে হবে, এ ফায়সালা কোন ব্যক্তিই করতে পারবে না। (আরো বেশী বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ খণ্ড, ১৫২-১৫৫ পৃষ্ঠা।

২১. এ থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজগৃহে বিরাট আকারে মেহমানদের আপ্যায়ন করা হতো। বড় বড় হাওয়ের সমান গামলা তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে লোকদের জন্য খাবার উঠিয়ে রাখা হতো। বৃহদাকার ডেগ বানিয়ে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে এক সংগে হাজার হাজার মানুষের খাদ্য পাকানো হতো।

২২. অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দাদের মতো কাজ করো। যে ব্যক্তি মুখেই কেবল অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করে কিন্তু তার অনুগ্রহকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তার নিছক মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থহীন। আসল কৃতজ্ঞ বান্দা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে তার

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهِمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
 مِنْسَاتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَ تَبِيتَ الْجَنَّةُ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ
 مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝٢٨

তারপর যখন সুলাইমানের ওপর আমি মৃত্যুর ফায়সালা প্রয়োগ করলাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর দেবার মতো সেই ঘূণ ছাড়া আর কোন জিনিস ছিল না যা তার লাঠিকে খেয়ে চলছিল। এভাবে যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, জিনদের কাছে একথা পরিস্কার হয়ে গেলো^{২৩} যে, যদি তারা অদৃশ্যের কথা জানতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।^{২৪}

মুখেও অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয় এবং এ সংগে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে তার ইচ্ছামতো কাজেও ব্যবহার করে।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে, تبينت الجن —এ বাক্যাংশের একটি অনুবাদ আমি ওপরে করেছি। এর আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে : জিনদের অবস্থা পরিস্কার হয়ে গেলো অথবা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে, খোদ জিনেরাই জানতে পারবে যে, অদৃশ্য বিষয় জানার ব্যাপারে তাদের ধারণা ভুল। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, সাধারণ মানুষেরা যারা জিনদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো তাদের কাছে একথা পরিস্কার হয়ে গেলো যে, জিনেরা কোন অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।

২৪. বর্তমান যুগের কোন কোন মুফাস্সির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন : হযরত সুলাইমানের (আ) ছেলে রাহব্'আম যেহেতু ছিলেন অযোগ্য, বিলাশী ও তোষামোদকারী মোসাহেব পরিবৃত, তাই নিজের মহিমাম্বিত পিতার ইন্তেকালের পর তার ওপর যে মহান দায়িত্ব এসে পড়েছিল তা পালন করতে তিনি সক্ষম হননি। তার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরেই রাষ্ট্রব্যবস্থা পতনমুখী হয় এবং আশপাশের সীমান্ত এলাকার যেসব উপজাতিকে (অর্থাৎ জিন) হযরত সুলাইমান (আ) তাঁর প্রবল পরাক্রমের মাধ্যমে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিলেন তারা সবাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই কুরআনের শব্দাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কুরআনের শব্দাবলী আমাদের সামনে যে নকশা পেশ করছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলাইমান এমন সময় মৃত্যুবরণ করেন যখন তিনি একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিলেন। এ লাঠির কারণে তাঁর নিশ্চাপ দেহ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি জীবিত আছেন মনে করেই জিনেরা তাঁর কাজ করে চলছিল। শেষে যখন লাঠিতে ঘূন ধরে গেলো এবং তা ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য হয়ে গেলো তখন তাঁর মরদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়লো এবং জিনেরা জানতে পারলো তিনি মারা গেছেন। এই পরিস্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘটনা বর্ণনার গায়ে এ ধরনের অর্থের প্রলেপ লাগাবার কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে যে, ঘূন অর্থ হচ্ছে হযরত সুলাইমানের

ছেলের অযোগ্যতা, লাঠি অর্থ হচ্ছে তাঁর কর্তৃত্ব ক্ষমতা এবং তাঁর মৃতদেহ পড়ে যাবার মানে হচ্ছে তাঁর রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া? এ বিষয়টি বর্ণনা করাই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে কি এ জন্য সাবলীল আরবী ভাষায় শব্দের আকাল হয়ে গিয়েছিল? এভাবে হেরফের করে তা বর্ণনা করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের হেঁয়ালি ও ধাঁধার ভাষা কুরআনের কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে? আর এ বাণী প্রথমে সে যুগের সাধারণ আরবদের সামনে যখন নাইল হয় তখন তারা কিভাবে এ ধাঁধার মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

তারপর এ ব্যাখ্যার সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এখানে জিন বলতে বুঝানো হয়েছে সীমান্ত উপজাতিগুলোকে, যাদেরকে হযরত সুলাইমান নিজেই সেবাকর্মে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ উপজাতিগুলোর মধ্যে কে অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল এবং মুশরিকরা কাকে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করতো? আয়াতের শেষের শব্দগুলো একটু মনোযোগ সহকারে পড়লে যে কোন ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারে, জিন বলতে এখানে অবশ্যই এমন কোন দল বুঝানো হয়েছে যারা নিজেরাই অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল অথবা লোকেরা তাদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনে করতো এবং তাদের অদৃশ্য বিষয়ক অজ্ঞতার রহস্য এ ঘটনাটিই উদঘাটন করে দিয়েছে যে, তারা হযরত সুলাইমানকে জীবিত মনে করেই তাঁর খেদমতে নিযুক্ত থাকে অথচ তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। কুরআনের এই সুস্পষ্ট বর্ণনা দেখার পর জিন বলতে সীমান্ত উপজাতিদেরকে বুঝানো হয়েছে এই মতটি পুনরবিবেচনা করা একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়ার সামনে জিন নামের একটি অদৃশ্য সৃষ্টির অস্তিত্ব মেনে নিতে যারা লজ্জা অনুভব করছিলেন তারা কুরআনের এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পর নিজেদের জটিল মনগড়া ব্যাখ্যার ওপরই জোর দিতে থাকেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন, আরবের মুশরিকরা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করতো এবং তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ

“আর তারা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।” (আল আন’আম, ১০০)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا

“আর তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে”

(আস্ সাফা, ১৫৮)

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ

“আর ব্যাপার হচ্ছে, মানব জাতির মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।” (আল জিন, ৬)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۚ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَلًا طَيِّبَةً وَرَبٌّ غَفُورٌ
 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِ ۖ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
 ذَوَاتِىٔ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُكُمْ
 بِمَا كَفَرُوا ۚ وَهَلْ نُنْجِيٓ إِلَّا الْكَافُرَ ۝

সাবার^{২৫} জন্য তাদের নিজেদের আবাসেই ছিল একটি নিদর্শন।^{২৬} দু'টি বাগান ডাইনে ও বামে।^{২৭} খাও তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন দেশ এবং ক্ষমশীল রব। কিন্তু তারা মুখ ফিরালো।^{২৮} শেষ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধতাজা বন্যা^{২৯} এবং তাদের আগের দু'টি বাগানের জায়গায় অন্য দু'টি বাগান তাদেরকে দিয়ে দিলাম যেখানে ছিল তিক্ত ও বিষাদ ফল এবং ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুল।^{৩০} এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমি তাদেরকে দিয়েছি এবং অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে আমি এহেন প্রতিদান দেই না।

তাদের এসব বিশ্বাসের মধ্যে একটি বিশ্বাস এও ছিল যে, তারা জিনদেরকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন মনে করতো এবং অদৃশ্য বিষয় জানার জন্য জিনদের শরণাপন্ন হতো। এ বিশ্বাসটির অসারতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ এখানে এ ঘটনাটি শুনাচ্ছেন এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তোমরা অনর্থক জাহেলিয়াতের মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়ে চলছো অথচ তোমাদের এ বিশ্বাসগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন। (আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সামনের দিকে ৬৩ টীকা দেখুন)

২৫. এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে প্রথম রুকু'র বিষয়বস্তু সামনে রাখতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে : আরবের কাফেররা আখেরাতের অগমনকে বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী মনে করতো এবং যে রসূল এ আকীদা পেশ করতেন তাঁর ব্যাপারে প্রকাশ্যে বলতো যে এ ধরনের অদ্ভুত কথা যে ব্যক্তি বলে সে পাগল হতে পারে অথবা জেনে বুঝে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ প্রথমে কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি পেশ করেন। ৭, ৮ ও ১২ টীকায় আমি এগুলো পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছি। এরপর দ্বিতীয় রুকু'তে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমানের এবং তারপর সাবার কাহিনীকে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির নিজের জীবন বৃত্তান্তই কর্মফল বিধানের সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে — একথাটি অনুধাবন করানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিজের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে মানুষ নিজেই একথা জানতে পারে যে, এ দুনিয়া এমন

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا
 فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿٥٦﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ
 بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ
 كُلَّ مَزْقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥٧﴾

আর আমি তাদের ও তাদের যে জনবসতিগুলোতে সমৃদ্ধি দান করেছিলাম, সেগুলোর অন্তরবর্তী স্থানে দৃশ্যমান জনপদ গঠন করেছিলাম এবং একটি আন্দাজ অনুযায়ী তাদের মধ্যকার ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলাম।^{৩১} পরিভ্রমণ করো এসব পথে রাত্রিদিন পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে। কিন্তু তারা বললো, “হে আমাদের রব! আমাদের ভ্রমণের দূরত্ব দীর্ঘায়িত করো।”^{৩২} তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে রেখে দিয়েছি এবং তাদেরকে একদম হিন্নভিন্ন করে দিয়েছি।^{৩৩} নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বেশী বেশী সবারকারী ও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য।^{৩৪}

কোন নৈরাজ্যময় জগত নয় যার সমগ্র কারখানাটি নিজের ইচ্ছামতো খামখেয়ালীভাবে চলে। বরং এমন এক আল্লাহ এখানে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন যিনি সবকিছু শুনে ও দেখেন। তিনি কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বনকারীদের সাথে এক ধরনের ব্যবহার করেন এবং অকৃতজ্ঞ ও নিয়ামত অস্বীকারকারীদের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করেন। যে আল্লাহর রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের নিয়মের অধীন। তাঁর রাজ্যে পুণ্য ও পাপের পরিণাম কখনো এক হতে পারে না। যদি কেউ শিক্ষা নিতে চায় তাহলে এ ইতিহাস থেকেই এ শিক্ষা নিতে পারে। তাঁর ইনসাফ ও ন্যায় নীতির অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটি সময় আসতেই হবে যখন সংকাজের পূর্ণ প্রতিদান এবং অসংকাজের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে।

২৬. অর্থাৎ এ বিষয়ের নিদর্শন যে, যা কিছু তারা লাভ করেছে তা কারো দান, তাদের নিজেদের উদ্ভাবন নয়। আর এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, তাদের বন্দেগী ও ইবাদাত এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার অধিকারী হচ্ছেন এমন এক আল্লাহ যিনি তাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন। ঐ নিয়ামত দানের ব্যাপারে যাদের কোন অংশ নেই তারা ইবাদাত ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী নয়। আবার এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, তাদের সম্পদ অবিনশ্বর নয় বরং যেভাবে তা এসেছে ঠিক তেমনিভাবে চলে যেতেও পারে।

২৭. এর অর্থ এ নয় যে, সাবা দেশে মাত্র দু’টিই বাগান ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সমগ্র সাবা রাজ্য শ্যামল সবুজ ক্ষেত ও বনানীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে দেখা যেতো ডাইনেও বাগান এবং বাঁয়েও বাগান।

২৮. অর্থাৎ বন্দেগী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তারা নাফরমানি ও নিমকহারামির পথ অবলম্বন করে।

২৯. মূলে বলা হয়েছে سَيْلُ الْعَرِمِ দক্ষিণ আরবের ভাষায় 'আরিম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'আরিমন' (عِرمَن) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে "বীধ"। ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সম্প্রতি যেসব প্রাচীন শিলালিপি সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোতে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৫৪২ বা ৫৪৩ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি সম্পর্কে বলা যায়। ইয়ামনের হাবশী গভর্ণর আব্রাহা "সাদি মারিব" এর সংস্কার কাজ শেষ করার পর এটি স্থাপন করেন। এতে তিনি বারবার এ শব্দটি বীধ অর্থে ব্যবহার করেন। কাজেই "সাইলুল আরিম" মানে হচ্ছে বীধ ভেঙ্গে যে বন্যা আসে।

৩০. অর্থাৎ 'সাইলুল আরিম' আসার ফলে সাবা এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। সাবার অধিবাসীরা পাহাড়ের মধ্যে বীধ বেঁধে যেসব খাল ও পানি প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল তা সব নষ্ট হয়ে যায় এবং পানি সেচের সমগ্র ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। এরপর যে এলাকা এক সময় জন্মাত সদৃশ ছিল তা আগাছা ও জংগলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেখানে নিছক বন্য কুল ছাড়া আর আহারযোগ্য কিছু থাকেনি।

৩১. "সমৃদ্ধ জনপদ" বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদে সাধারণভাবে এ গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর উল্লেখ করা হয়েছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন আল আ'রাফ, ১৩৭ আয়াত; বনী ইসরাঈল, ১ আয়াত এবং আল আযিয়া, ৭১ ও ৮১ আয়াত)

"দৃশ্যমান জনপদ" হচ্ছে এমন সব জনবসতি যেগুলো সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত। কোন এক কোণায় আড়ালে অবস্থিত নয়। আবার এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ জনবসতিগুলো বেশী দূরে দূরে অবস্থিত ছিল না বরং লাগোয়া ছিল। একটি জনপদের চিহ্ন শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনপদ শুরু হয়ে যেতো।

একটি আন্দাজ অনুযায়ী ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করার মানে হচ্ছে, ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পুরা সফর অবিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতো, এর এক মজিল থেকে আর এক মজিলের দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা ছিল। জনবসতিপূর্ণ এলাকা সফর ও অনাবাদ মরু এলাকা সফরের মধ্যে এ পার্থক্য থাকে। মরুভূমির মধ্যে মুসাফির যতক্ষণ চায় চলে এবং যতক্ষণ চলে কোথাও এক জায়গায় ডেরা বাঁধে। পক্ষান্তরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পথের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদ পর্যন্ত এলাকার মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা থাকে। পথিক পথে কোন কোন জায়গায় ধামবে, দুপুরে কোথায় বিশ্রাম নেবে এবং কোথায় রাত কাটাবে এর পূর্ণ কর্মসূচী পূর্বাঙ্কেই তৈরি করে নিতে পারে।

৩২. তারা যে মুখে এ দোয়া উচ্চারণ করেছিল, এমনটি অপরিহার্য নয়। আসলে যে ব্যক্তিই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় সে যেন তার অবস্থা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একথা বলে, হে আল্লাহ! আমি এ নিয়ামতগুলোর যোগ্য নই। অনুরূপভাবে যে জাতি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে অথবা সুবিধা লাভ করে সে যেন নিজের রবের কাছে দোয়া করে, হে আমাদের রব! এ অনুগ্রহগুলো আমাদের থেকে ছিনিয়ে নাও, কারণ আমরা এর যোগ্য নই।

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوَفِّي
 بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۖ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ۝

তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সঠিক পেয়েছে এবং একটি ক্ষুদ্র মু'মিন দল ছাড়া বাকি সবাই তারই অনুসরণ করেছে। ৩৫ তাদের ওপর ইবলিসের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্য হয়েছে যে, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে পরকাল মান্যকারী এবং কে সে ব্যাপারে সন্ধিহান। ৩৬ তোমার রব সব জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক। ৩৭

এ ছাড়াও رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا (হে আল্লাহ! আমাদের সফর দীর্ঘায়িত করে দাও)—এ শব্দগুলো থেকে কিছুটা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত সাবা জাতির চোখে তাদের বিপুল জনসংখ্যা বিরক্তিকর মনে হয়েছিল এবং অন্যান্য জাতির মতো তারাও নিজেদের বর্ধিত জনসংখ্যাকে সংকট মনে করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়েছিল।

৩৩. অর্থাৎ সাবা জাতি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে তাদের বিক্ষিপ্ততা ও বিশৃংখলা প্রবাদে পরিণত হয়। আজো যদি আরববাসী কোন জাতির মধ্যকার বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের কথা আলোচনা করে তাহলে বলে تَفَرَّقُوا اِئْدَى سَبَا “তারা তো এমন নৈরাজ্যের শিকার হয়েছে যেমন সাবা জাতি নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল।” আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন অনুগ্রহের অবসান ও অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয় তখন সাবার বিভিন্ন গোত্র নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করে আরবের বিভিন্ন এলাকায় চলে যায়। গাস্‌সানীরা জর্দান ও সিরিয়ার দিকে চলে যায়। আওস ও খায়রাজ গোত্র ইয়াসরিবে বসতি স্থাপন করে। খুযা'আহ গোত্র জেদ্দার নিকটবর্তী তিহামা এলাকায় আবাস গড়ে তোলে। আয্দ গোত্র ওমানে গিয়ে ঠাঁই নেয়। লাখ্ম, জযাম এবং কিন্দাও বেরিয়ে পড়তে বাধ্য নয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত সাবা নামে কোন জাতিই আর দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকেনি। কেবলমাত্র গল্প কাহিনীতেই তার আলোচনা থেকে গেছে।

৩৪. এ প্রেক্ষাপটে সবারকারী ও কৃতজ্ঞ বলতে এমন ব্যক্তি বা দল বুঝায় যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত লাভ করে অহংকারে মেতে ওঠে না, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আভ্যন্তরী হয় না এবং যে আল্লাহ এসব কিছু দান করেছেন তাঁকে ভুলে যায় না। এ ধরনের লোকেরা যারা উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ পেয়ে নাকফরমানির পথ অবলম্বন করে এবং অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয় তাদের অবস্থা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারে।

৩৫. ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকে সাবা জাতির মধ্যে এমন একটি দল ছিল যারা অন্য উপাস্যদেরকে মেনে চলার পরিবর্তে এক আল্লাহকে মেনে চলতো।

বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব শিলালিপি উদ্ধার করা হয় তার মধ্য থেকে কোন কোনটি এই স্বল্প সংখ্যক দলের অস্তিত্ব চিহ্নিত করে। খৃঃ পূঃ ৬৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের কোন কোন শিলালিপি একথা বলে যে, সাবা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু ইবাদাত গৃহ স্থাপিত ছিল যেগুলো আসমানি বা আসমান ওয়ালার (অর্থাৎ আসমানের রব) ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কোন কোন স্থানে এ উপাস্যের নাম ملكن نوسموى (আকাশসমূহের মালিক বাদশাহ) লেখা হয়েছে। এ দলের লোকেরা একনাগাড়ে শত শত বছর ইয়ামনে বাস করতে থাকে। কাজেই ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে একটি শিলালিপিতে الله نوسموى (আকাশসমূহের ইলাহ) নামে একটি ইবাদাত গৃহ নির্মাণের উল্লেখ দেখা যায়। তারপর ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এ শব্দগুলো পাওয়া যায় : بنصروردا الهن : بعلى سمعين وارضىين (অর্থাৎ এমন খোদার মদদ ও সাহায্য সহকারে যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিক)। একই সময়ের ৪৫৮ খৃষ্টাব্দের আর একটি শিলালিপিতে একই খোদার জন্য “রহমান” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মূল শব্দ হচ্ছে بردا برحمن (অর্থাৎ রহমানের সাহায্য)।

৩৬. অর্থাৎ এ ক্ষমতা ইবলিসের ছিল না যে তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে চাচ্ছিল কিন্তু ইবলিস জোর করে তাদেরকে নাফরমানির পথে টেনে নিয়ে গেছে। আল্লাহ তাকে যে শক্তি দিয়েছিলেন তা কেবল এতটুকুই ছিল যে, সে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে এবং যারা তার পিছনে চলতে চায় তাদেরকে নিজের অনুসারী করতে পারে। যারা পরকাল মানে এবং যারা পরকালের অগমনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য ইবলিসকে এ বিপথগামী করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

অন্য কথায় আল্লাহর এ বাণী এ সত্যটিই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন জিনিসই এমন নেই যা এ দুনিয়ায় মানুষকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার গ্যারান্টি দিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি একথা না মানে যে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত হতে হবে এবং আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাহলে সে অবশ্যই পথ ভ্রষ্ট ও কুপথগামী হবে। কারণ যে দায়িত্বানুভূতি মানুষকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে তা তার মধ্যে আদৌ সৃষ্টিই হতে পারবে না। তাই শয়তান মানুষকে আখেরাত থেকে গাফিল করে দেয়। এটিই তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং এর সাহায্যেই সে মানুষকে নিজের ফাঁদে আটকে ফেলে। যে ব্যক্তি তার এ প্রতারণা জাল ছিন্ন করে বের হয়ে আসে সে কখনো নিজের আসল চিরন্তন জীবনের স্বার্থকে দুনিয়ার এ সাময়িক জীবনের স্বার্থে কুরবানী করে দিতে রাজি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শয়তানের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে অথবা কমপক্ষে সে ব্যাপারে সন্দেহান হয়ে পড়ে সে কখনো এ দুনিয়ায় যে নগদ লাভ পেয়ে যাচ্ছে তা থেকে কেবলমাত্র এ ক্ষণিক হাত সংকুচিত করে নিতে রাজি হবে না যে এর ফলে পরবর্তী জীবনে ক্ষতি হবার আশংকা আছে। দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই কখনো পথভ্রষ্ট হয়েছে তার পথভ্রষ্টতা এ আখেরাত অস্বীকার বা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কারণেই সংঘটিত হয়েছে এবং যে-ই সঠিক পথ অবলম্বন করেছে তার সঠিক কর্মের ভিত্তি আখেরাতের প্রতি ঈমানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩৭. কুরআন মজীদে সাবা জাতির ইতিহাসের প্রতি যে ইংগিত করা হয়েছে তা অনুধাবন করতে হলে এ জাতি সম্পর্কে ইতিহাসের অন্যান্য মাধ্যম থেকে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোও সামনে ধাকা প্রয়োজন।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে সাবা দক্ষিণ আরবের একটি বৃহৎ জাতির নাম। কতগুলো বড় বড় গোত্র সমন্বয়ে এ জাতিটি গড়ে উঠেছিল। ইমাম আহমাদ ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবদুল বার ও তিরমিযী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। সাবা ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার বংশ থেকে নিম্নোক্ত গোত্রগুলোর উদ্ভব হয় : কিন্দাহ, হিমযার, আয্দ, আশ'আরীন, মাযহিজ, আনযার (এর দু'টি শাখা : খাস'আম ও বাজীলাহ), আমেলাহ, জুযান, লাখ্ম ও গাস্‌সান।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবে এ জাতির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে উর-এর শিলালিপিতে সাবোম নামের মধ্য দিয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার শিলালিপিতে এবং অনুরূপভাবে বাইবেলেও ব্যাপকহারে এর উল্লেখ দেখা যায়। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন যাবুর ৭২ : ১৫, যিরমিয় ৬ : ২০, যিহিঙ্কেল ২৭ : ২২ ও ৩৮ : ১৩ এবং ইয়োব ৬ : ১৯) গ্রীক ও রোমীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং ভূগোলবিদগণ থিয়োফ্রাস্টিসের (খৃঃ পূঃ ২৮৮) সময় থেকে খৃষ্ট পরবর্তী কয়েক শো বছর পর্যন্ত অবিস্মৃতিভাবে এর আলোচনা করে এসেছেন।

এ জাতির আবাসভূমি ছিল আরবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্তমানে ইয়ামন নামে পরিচিত এলাকাটি। এর উত্থানকাল শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব এগারো শো বছর থেকে। হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের যুগে একটি ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি হিসেবে সারা দুনিয়ায় এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে এটি ছিল একটি সূর্যোপাসক জাতি। তারপর এর রাণী যখন হযরত সুলাইমানের (৯৬৫-৯২৬ খৃঃ পূঃ) হাতে ঈমান আনেন তখন জাতির বেশীর ভাগ লোক মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু পরে না জানি কোন্‌ সময় থেকে আবার তাদের মধ্যে শিরক ও মূর্তিপূজা প্রবল হয় এবং তারা আলমাকা (চন্দ্র দেবতা), 'আশতার (শুক্ল) যাতে হামীম ও যাতে বা'দা (সূর্যদেবী), হোবস হারমতম বা হারীমত এবং এ ধরনের আরো বহু দেব-দেবীর পূজা করতে শুরু করে। আলমাকা ছিল এ জাতির সবচেয়ে বড় দেবতা। তাদের বাদশাহ নিজেকে এ দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করতো। ইয়ামনে এমন অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায়, সমগ্র দেশ উল্লেখিত দেবতাবৃন্দ বিশেষ করে আলমাকার মন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতো।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইয়ামন থেকে প্রায় ৩ হাজার শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো সাবা জাতির ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে। এই সংগ্রে আরবীয় ঐতিহ্য ও প্রবাদ এবং গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্র করলে এ জাতির একটি বিস্তারিত ইতিহাস লেখা যেতে পারে। এসব তথ্যাবলীর দৃষ্টিতে তার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুগগুলো নিম্নভাবে বিবৃত করা যেতে পারে :

এক : খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দের পূর্ববর্তী যুগ। এ সময় সাবার রাজার উপাধি ছিল "মুকাররিবে সাবা" (مكرب سبأ)। সম্ভবত এখানে مكرب শব্দটি এর

সমার্থক ছিল। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় : এ বাদশাহ মানুষ ও খোদাদের মধ্যে নিজেকে সংযোগ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতেন। অথবা অন্যকথায় বলা যায়, তিনি ছিলেন পুরোহিত বাদশাহ (Priest Kings) এ সময় তাঁর রাজধানী ছিল সারওয়াহ নগরীতে। মারিবের পশ্চিম দিকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত খারীবাহ নামক স্থানে আজো এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ আমলে মারিবের বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাদশাহ এর সীমানা আরো সম্প্রসারিত করেন।

দুই : খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার বাদশাহরা মুকাররিব উপাধি ত্যাগ করে মালিক (বাদশাহ) উপাধি গ্রহণ করেন। এর অর্থ হয়, রাজ্য পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবধারার পরিবর্তে রাজনীতি ও সেকুলারিজমের রং প্রাধান্য লাভ করেছে। এ আমলে সাবার বাদশাহগণ সারওয়াহ ত্যাগ করে মারিবকে তাদের রাজধানী নগরীতে পরিণত করেন এবং এর অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। এ নগরটি সাগর থেকে ৩৯০০ ফুট উঁচুতে সানয়া থেকে ৬০ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। আজ পর্যন্ত এর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক সময় এটি ছিল দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জাতির কেন্দ্রভূমি।

তিন : ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়। এ সময় সাবার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হিময়ার গোত্র প্রাধান্য লাভ করে। এটি ছিল সাবা জাতিরই অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতি। অন্যান্য উপজাতিদের থেকে এদের লোকসংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এ আমলে মারিবকে জনশূন্য করে যাইদানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ শহরটি ছিল হিময়ার গোত্রের কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এ শহরটি যাকার নামে আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে ইয়েরেম শহরের কাছে একটি গোলাকার পর্বতের ওপর এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং এরই কাছাকাছি এলাকায় হিময়ার নামে একটি ক্ষুদ্রাকার উপজাতির বসতি রয়েছে। একে দেখে কোন ব্যক্তি ধারণাই করতে পারবে না যে, এটি এমন একটি জাতির স্মৃতিচিহ্ন একদিন যার ডংকা নিনাদ সমগ্র বিশ্বে গুঞ্জনিত হতো। এ সময়ই রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে ইয়ামনত ও ইয়ামনিয়াত শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এটি আরবের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত আসীর থেকে আদন (এডেন) এবং বাবুল মান্দাব থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নামে পরিণত হয়। এ সময়ই সাবা জাতির পতন শুরু হয়।

চার : ৩০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইসলামের প্রারম্ভিকাল পর্যন্ত সময়। এটি ছিল সাবা জাতির ধ্বংসের সময়। এ সময় তাদের মধ্যে অনবরত গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। বাইরের জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়। শেষে জাতীয় স্বাধীনতারও বিলোপ ঘটে। প্রথমে যাইদানী, হিময়ারী ও হামদানীদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে ৩৪০ থেকে ৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়ামনে হাবশীদের রাজত্ব চলে। তারপর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় ঠিকই কিন্তু মারিবের বিখ্যাত বাঁধে ফাটল দেখা দিতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ৪৫০ বা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে এবং এর ফলে যে মহাপ্রাচীন হয় তার উল্লেখ কুরআন মজীদের ওপরের আয়াতে করা হয়েছে। যদিও এরপর থেকে আব্রাহার সময় পর্যন্ত অনবরত বাঁধের মেরামত কাজ চলতে থাকে তবুও যে জনবসতি একবার স্থানচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল তা পুনরায় আর একত্র হতে পারেনি এবং পানিসেচ ও কৃষির যে ব্যবস্থা একবার

বিক্ষস্ত হয়ে গিয়েছিল তার আর পুনরগঠন সম্ভবপর হয়নি। ৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইয়ামনের ইহুদি বাদশাহ যু-নওয়াস নাজ্জানের খৃষ্টানদের ওপর যে জুলুম-নিপীড়ন চালায় কুরআন মজীদে আসহাবুল উখদুদ নামে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে হাব্শার (আবিসিনিয়া এবং বর্তমানে ইথিওপিয়া) খৃষ্টান শাসক ইয়ামনের ওপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালান। তিনি সমগ্র দেশ জয় করে নেন। এরপর ইয়ামনের হাবশী গভর্ণর আব্রাহা কা'বা শরীফের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব খতম করার এবং আরবের সমগ্র পশ্চিম এলাকাকে রোমান-হাবশী প্রভাবাধীনে আনার জন্য ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের মাত্র কিছুদিন পূর্বে মক্কা মুআযযমা আক্রমণ করে। এ অভিযানে তার সমগ্র সেনাদল যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় কুরআন মজীদে আসহাবুল ফীল শিরোনামে তা উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরানীরা ইয়ামন দখল করে ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানী গভর্ণর বাযান-এর ইসলাম গ্রহণের পর এ দখল দারিত্বের অবসান ঘটে।

সাবা জাতির উত্থান মূলত দুইটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক, কৃষি এবং দুই, ব্যবসায়। কৃষিকে তারা পানিসেচের একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত করে। প্রাচীন যুগে ব্যাবিলন ছাড়া আর কোথাও এর সমপর্যায়ের পানিসেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সে দেশটি প্রাকৃতিক নদী সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল না। বর্ষাকালে পাহাড় থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হতো। সারা দেশে এ ঝরণাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ বেঁধে তারা কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করতো। তারপর এ হ্রদগুলো থেকে খাল কেটে সারা দেশে এমনভাবে পানি সেচের ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিল যাকে কুরআন মজীদে বর্ণনামতে, যেদিকে তাকাও সেদিকেই কেবল বাগ-বাগিচা ও সবুজ-শ্যামল গাছ-গাছালি দেখা যেতো। এ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় জলাধারটি মারিব নগরীর নিকটবর্তী বাল্ক পাহাড়ের মধ্যস্থলের উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি যখন তাদের ওপর থেকে সরে গেলো তখন পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ বিশাল বাঁধটি ভেঙে গেলো। এ সময় এ থেকে যে বন্যা সৃষ্টি হলো তা পথের বাঁধগুলো একের পর এক ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চললো, এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশের সমগ্র পানিসেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলো এবং এরপর আর কোনভাবেই এ ব্যবস্থা পুনরবহাল করা গেলো না।

ব্যবসায়ের জন্য এ জাতিকে আল্লাহ সর্বোত্তম ভৌগলিক স্থান দান করেছিলেন। তারা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। এক হাজার বছরের বেশী সময় পর্যন্ত এ জাতিটিই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসায়ের সংযোগ মাধ্যমের স্থান দখল করে থাকে। একদিকে তাদের বন্দরে চীনের রেশম, ইন্দোনেশিয়া ও মালাবারের গরম মশলা, হিন্দুস্তানের কাপড় ও তলোয়ার, পূর্ব আফ্রিকার যংগী দাস, বানর, উটপাখির পালক ও হাতির দাঁত পৌছে যেতো এবং অন্যদিকে তারা এ জিনিসগুলোকে মিসর ও সিরিয়ার বাজারে পৌছিয়ে দিতো। সেখান থেকে সেগুলো গ্রীস ও রোমে চলে যেতো। এ ছাড়াও তাদের নিজেদের এলাকায়ও উৎপন্ন হতো লোবান, চন্দন কাঠ, আশ্বর, মিশুক, মুর, কারফা, কাসুবুখ, যারীরাহ, সালীখাহ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে। মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও রোমের লোকেরা এগুলো লুফে নিতো।

দু'টি বড় বড় পথে এ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য চলতো। একটি ছিল সমুদ্রপথ এবং অন্যটি স্থলপথ। হাজার বছর পর্যন্ত সমুদ্রপথে ব্যবসায় ছিল সাবায়ীদের একচেটিয়া দখলে। কারণ

লোহিত সাগরের মৌসুমী বায়ু প্রবাহ, ভূগর্ভস্থ পাহাড় ও নোঙ্গর করার স্থানগুলোর গোপন তথ্য একমাত্র তারা ই জানতো। অন্য কোন জাতির এ ভয়াল সাগরে জাহাজ চালাবার সাহসই ছিল না। এ সামদ্রিক পথে তারা জর্দান ও মিসরের বন্দরসমূহে নিজেদের পণ্যদ্রব্য পৌঁছিয়ে দিতো। অন্যদিকে স্থলপথ আদন (এডেন) ও হাদরামাউত থেকে মারিবে গিয়ে মিশতো এবং তারপর আবার সেখান থেকে একটি রাজপথ মক্কা, জেদ্দা, ইয়াসরিব, আল'উলা, তাবুক ও আইলা হয়ে পেট্রা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এরপর একটি পথ মিসরের দিকে এবং অন্য পথটি সিরিয়ার দিকে যেতো। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, এ স্থলপথে ইয়ামন থেকে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সাবায়ীদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত এ পথে যাওয়া আসা করতো। এ উপনিবেশগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর ধ্বংসাবশেষ এ এলাকায় আজো রয়ে গেছে এবং সেখানে সাবায়ী ও হিমযারী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে।

খৃস্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে এ ব্যবসায়ের অধোগতি শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্রীক ও তারপর রোমানদের শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা এ মর্মে শোরগোল শুরু করে দেয় যে, আরব ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইজারাদারীর কারণে প্রাচ্যের ব্যবসায় পণ্যের ইচ্ছামতো মূল্য আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে, এ ময়দানে অগ্রবর্তী হয়ে এ বাণিজ্য আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মিসরের গ্রীক বংশোদ্ভূত শাসক দ্বিতীয় বাতলিমুস (২৮৫-২৮৬ খৃঃ পূঃ) সেই প্রাচীন খালটি পুনরায় খুলে দেন, যা সতের শো বছর আগে ফেরাউন সিসুস্ত্রীস নীলনদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এ খালটি খনন করেছিলেন। এ খালের মাধ্যমে মিসরের নৌবহর প্রথমবার লোহিত সাগরে প্রবেশ করে কিন্তু সাবায়ীদের মোকাবিলায় এ প্রচেষ্টা বেশী কার্যকর প্রমাণিত হতে পারেনি। তারপর রোমানরা যখন মিসর দখল করে তখন তারা লোহিত সাগরে অধিকতর শক্তিশালী বাণিজ্য বহর নিয়ে আসে এবং তার পশ্চাতভাগে একটি নৌবাহিনীও জুড়ে দেয়। এ শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা সাবায়ীদের ছিল না। রোমানরা বিভিন্ন বন্দরে নিজেদের ব্যবসায়িক উপনিবেশ গড়ে তোলে সেখানে জাহাজের প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে। যেখানে সম্ভব হয় সেখানে নিজেদের সামরিক বাহিনীও রেখে দেয়। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসে যখন এডেনের ওপর রোমানদের সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুযোগে রোমান ও হাবশী শাসকরা সাবায়ীদের মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে চক্রান্ত করে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত এ জাতির স্বাধীনতা সূর্যও অস্তমিত হয়।

নৌবাণিজ্য বেদখল হয়ে যাবার পর সাবায়ীদের হাতে থেকে যায় শুধুমাত্র স্থলপথের বাণিজ্য। কিন্তু নানাবিধ কারণে ধীরে ধীরে তারও কোমর ভেঙে যায়। প্রথমে নাবতীরা পেট্রা থেকে নিয়ে আল'উলা পর্যন্ত হিজাজ ও জর্দানের উচ্চভূমির সমস্ত উপনিবেশ থেকে সাবায়ীদেরকে বের করে দেয়। তারপর ১০৬ খৃষ্টাব্দে রোমানরা নাবতী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে হিজাজের সীমান্ত পর্যন্ত সিরিয়া ও জর্দানের সমস্ত এলাকা নিজেদের শত্রু হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। এরপর হাবশা ও রোম সাবায়ীদের পারস্পরিক সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে তাদের ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ কারণে হাবশীরা বারবার ইয়ামনের ব্যাপারে নাক গলাতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশ অধিকার করে নেয়।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ
 مِنْ ظَمِيرٍ ۝ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا
 فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

৩ রুকু'

(হে নবী! ৩৮ এ মুশরিকদেরকে) বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদকে তোমরা নিজেদের উপাস্য মনে করে নিয়েছো তাদেরকে ডেকে দেখো। ৩৯ তারা না আকাশে কোন অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক, না পৃথিবীতে। আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানায় তারা শরীকও নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ শাফায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহর কাছে তার জন্য ছাড়া আর কারো জন্য কোন শাফায়াত উপকারী হতে পারে না। ৪০ এমনকি যখন মানুষের মন থেকে আশংকা দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদেরকে) জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, ঠিক জবাব পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম। ৪১

এভাবে আল্লাহর ক্রোধ এ জাতিতে উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে টেনে নামিয়ে এমন এক গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে যেখান থেকে কোন অভিশপ্ত জাতি আর কোনদিন বের হয়ে আসতে পারেনি। এক সময় ছিল যখন তার সম্পদশালিতার কথা শুনে গ্রীক ও রোমানরা ভীষণভাবে প্রলুব্ধ হতো। অষ্টাব্দ লিখছেন : তারা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতো। তাদের গৃহের ছাদ, দেয়াল ও দরোজায়ও হাতির দাঁত, সোনা, রূপা ও হীরা জহরতের কারুকাজে পরিপূর্ণ থাকতো। প্লিনি লিখেছেনঃ রোম ও পারস্যের সম্পদ তাদের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারা তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। তাদের সবুজ-শ্যামল দেশ বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশুতে পরিপূর্ণ। আর্ট মেড্রোস বলেন : তারা বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। জ্বালানী কাঠের পরিবর্তে তারা দারুচিনি, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাঠ ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তাদের এলাকার সমুদ্রোপকূল অতিক্রমকারী বিদেশী জাহাজগুলোতেও খোশবুর ছোঁয়াচ পৌছে যেতো। তারাই ইতিহাসে প্রথমবার সান'আর উচ্চ পার্বত্য স্থানসমূহে আকাশ ছোঁয়া (Skyscraper) ইমারত নির্মাণ করে। গুমদান প্রাসাদ নামে এগুলো দীর্ঘকাল ধরে প্রসিদ্ধ থাকে। আরব ঐতিহাসিকদের

বর্ণনা অনুযায়ী এগুলো ছিল ২০ তলা বিশিষ্ট ইমারত এবং প্রত্যেকটি তলার উচ্চতা ছিল ৩৬ ফুট। আল্লাহর অনুগ্রহ যতদিন তাদের সহযোগী ছিল ততদিন এসব কিছু ছিল। শেষে যখন তারা চরমভাবে অনুগ্রহ অস্বীকার করার এবং নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবার পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন মহান সর্বশক্তিমান রবের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে চিরকালের জন্য সরে যায় এবং তাদের নাম নিশানা পর্যন্তও মুছে যায়।

৩৮. আগের দুই রুকু'তে আখেরাত সম্পর্কে মুশরিকদের ভুল ধারণার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছিল। এবার শিরক খণ্ডন করার দিকে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৩৯. অর্থাৎ এখনই তোমরা দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমা সালাম এবং সাবা জাতির আলোচনায় যেমন শুনলে সেভাবেই আল্লাহ ব্যক্তি, জাতি ও রাজ্যের ভাগ্য ভাঙা-গড়া করেন। এখন তোমাদের বানোয়াট উপাস্যদেরকে ডেকে দেখে নাও। তারাও কি কারো দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে এবং সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে?

৪০. অর্থাৎ কারো নিজে মালিক হয়ে বসা, মালিকানায শরীক হওয়া অথবা আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া তো দূরের কথা সমগ্র বিশ্ব-জাহানে এমন কোন সত্তা নেই যে আল্লাহর সামনে কারো পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারে। তোমরা এই ভুল ধারণা নিয়ে বসে রয়েছো যে, আল্লাহর এমন কিছু প্রিয়জন আছে অথবা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে এমন কিছু শক্তিশালী বান্দা আছে যারা একবার বেকঁবে বসলে আল্লাহকে তাদের সুপারিশ মানতেই হবে। অথচ সেখানে অবস্থা হচ্ছে এই যে, অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খোলার সাহসই করতে পারে না। যে অনুমতি লাভ করবে একমাত্র সে-ই কিছু নিবেদন করতে পারবে। আর যার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি পাওয়া যাবে একমাত্র তার সপক্ষেই আবেদন নিবেদন করা যাবে। (সুপারিশের ইসলামী বিশ্বাস এবং সুপারিশের মুশরিকী বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস, ৫ ও ২৩; সূরা হূদ, ৮৪ ও ১০৬; আন নাহুল, ৬৪ ও ৭৯; সূরা তা-হা, ৮৬; আল আযিয়া, ২৭ এবং আল হাজ্জ ১২৫ টীকা দেখুন।

৪১. কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশকারী যখন কারো পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি চাইবে তখনকার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সে চিত্রে আমাদের সামনে যে অবস্থা ফুটে উঠছে তা হচ্ছে এই যে, অনুমতি চাওয়ার আবেদন পেশ করার পর সুপারিশকারী ও যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তারা দু'জনই অত্যন্ত অস্থিরভাবে ভীতি ও উদ্বেগের সাথে জবাবের জন্য প্রতীক্ষারত। শেষ পর্যন্ত যখন ওপর থেকে অনুমতি এসে যায় এবং সুপারিশকারীর চেহারা দেখে যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে সে ব্যাপারটা আর উদ্বেগজনক নয় বলে অনুমান করতে থাকে তখন তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। সে এগিয়ে গিয়ে সুপারিশকারীকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, “কি জবাব এসেছে?” সুপারিশকারী বলে, “ঠিক আছে, জবাব পাওয়া গেছে।” একথার মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নির্বোধের দল! এ হচ্ছে যে দরবারের অবস্থা সে সম্পর্কে তোমরা কেমন করে এ ধারণা করতে পারলে যে সেখানে কেউ নিজের বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেবে অথবা কারো সেখানে ধর্না দিয়ে বসে পড়ে আল্লাহকে একথা বলার সাহস হবে যে, এ ব্যক্তি আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার লোক, একে মাফ করতেই হবে?

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٨٢ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عِمَّا أَجْرْنَا
وَلَا نَسْأَلُ عِمَّا نَعْمَلُونَ ۝٨٣

(হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, “কে তোমাদের আকাশসমূহ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে?” বলাও, “আল্লাহ, ৪২ এখন অবশ্যই আমরা অথবা তোমরা সঠিক পথে অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত।” ৪৩ তাদেরকে বলাও, “আমরা যে অপরাধ করেছি সে জন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কিছু করছো সে জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না।” ৪৪

৪২. প্রশ্ন ও জবাবের মাঝখানে একটি সূক্ষ্মতর শূন্যতা রয়েছে। সম্বোধন করা হয়েছিল মুশরিকদেরকে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব তো স্বীকার করতোই অধিকন্তু তাঁর হাতেই যে রিযিকের চাবিকাঠি রয়েছে একথাও জানতো এবং মানতো। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যদেরকেও শরীক করতো। এখন যখন তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়, বলাও কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দিচ্ছেন তখন তারা সমস্যায় পড়ে যায়। জবাবে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নাম নিলে তা নিজেদের ও নিজেদের জাতির আকিদা-বিশ্বাসের বিরোধী হয়ে যায় আবার ইঠকারী হয়ে এমন কথা বলে দিলেও তাদের নিজেদের জাতির লোকেরাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে বলে আশংকা করে। আর যদি আল্লাহকেই রিযিকদাতা বলে মেনেই নেয় তাহলে তো সংগে সংগেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি সামনে এসে যায় যে, তাহলে অন্য সব উপাস্যরা কোন্ কাজের? এদেরকে তোমরা উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন? রিযিক দেবেন আল্লাহ আর পূজা করা হবে এদেরকে, এটা কেমন কথা? তোমরা কি একেবারে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছো, এতটুকু কথাও বুঝো না? এই দ্বিবিধ সংকটে পড়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারা ‘আল্লাহ রিযিক দেন’, একথাও বলে না, আবার একথাও বলে না যে, অন্য কোন মাবুদ রিযিক দেয়। প্রশ্নকারী যখন দেখছেন কোন জবাব আসছে না তখন তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাবে বলেন, “আল্লাহ।”

৪৩. এ বাক্যাংশে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ওপরের প্রশ্ন ও জবাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি এই ছিল যে, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও উপাসনা করবে সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করবে সে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। এ কারণে বাহ্যত এরপর একথাই বলা উচিত ছিল যে, আমরা সঠিক পথে আছি এবং তোমরা পথভ্রষ্ট। কিন্তু এ ধরনের স্পষ্টোক্তি সত্যকথনের দিক থেকে যতই সঠিক হোক না কেন প্রচার কৌশলের দিক থেকে মোটেই সঠিক হতো না। কারণ যখনই কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে আপনি সরাসরি তাকে পথভ্রষ্ট বলে দেবেন এবং নিজেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবেন তখনই সে জিদ ও

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٥٥﴾
 قُلْ أَرَأُونِيَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا لَهُ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٦﴾

বলো, “আমাদের রব আমাদের একত্র করবেন, তারপর আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করে দেবেন। তিনি এমন পরাক্রমশালী শাসক যিনি সবকিছু জানেন।” ৪৫ তাদেরকে বলো, “আমাকে একটু দেখাও তো, কারা তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করে রেখেছো।” ৪৬ কখনো না, প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান তো একমাত্র আল্লাহই।

হঠকারিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে এবং সত্যের জন্য তার হৃদয় দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহর নবীকে যেহেতু শুধুমাত্র সত্য কথনের জন্য পাঠানো হয় না বরং তাঁর প্রতি এ দায়িত্বও আরোপিত থাকে যে, সর্বাধিক কৌশল অবলম্বন করে তিনি বিভ্রান্ত লোকদের সংশোধন করবেন, তাই আল্লাহ একথা বলেননি, হে নবী! এ প্রশ্ন ও জবাবের পরে এবার তুমি লোকদেরকে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা পথভ্রষ্ট এবং একমাত্র আমিই সঠিক পথে আছি। এর পরিবর্তে বরং এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে এখন এভাবে বুঝাও। তাদেরকে বলো, আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার এ পার্থক্য তো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমরা এমন মাবুদকে মানি যিনি রিযিক দেন এবং তোমরা এমন সব সত্তাকে মাবুদে পরিণত করছো যারা রিযিক দেয় না। এখন আমাদের ও তোমাদের একই সাথে সঠিক পথাবলম্বী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। এ সুস্পষ্ট পার্থক্য সহকারে তো আমাদের মধ্য থেকে এক পক্ষই সঠিক পথাবলম্বী হতে পারে এবং অন্যপক্ষ অবশ্যই হবে পথভ্রষ্ট। এরপর তোমরা নিজেরাই চিন্তা করবে, যুক্তি ও প্রমাণ কার সঠিক পথাবলম্বী হবার পক্ষে রায় দিচ্ছে এবং সে দৃষ্টিতে কেইবা পথভ্রষ্ট।

৪৪. ওপরের বক্তব্য শ্রোতাদেরকে প্রথমেই চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। এরপর এই আরো একটি বাক্য বলা হলো। যাতে তারা আরো বেশী চিন্তা করার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে তাদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, সঠিক পথ ও ভুল পথের এ বিষয়টির যথাযথ ফায়সালা করা আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থের দাবী। ধরে নেয়া যাক আমরা পথভ্রষ্ট, তাহলে এ ভ্রষ্টতার খোশারত আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে, তোমরা এ জন্য পাকড়াও হবে না। তাই কোন আকিদা গ্রহণ করার আগে আমরা কোন ভুল পথে যাচ্ছি কিনা একথা ভালোভাবে চিন্তা করে নিতে হবে, এটা আমাদের নিজেদের স্বার্থের দাবী। অনুরূপভাবে আমাদের কোন স্বার্থে নয় বরং তোমাদের নিজেদের কল্যাণার্থেই একটি আকিদায় স্থির বিশ্বাস স্থাপন করার আগে তোমাদের ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিতে হবে কোথাও কোন বাতিল মতবাদের পেছনে তোমরা নিজেদের জীবনের সমস্ত মূলধন

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٥﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٦﴾ قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِيرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقِيلُونَ ﴿٨٧﴾

আর (হে নবী!) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি কিন্তু বেশীর ভাগ লোক জানে না।^{৪৫}

তারা তোমাকে বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে সেই কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?^{৪৬} বলা, তোমাদের জন্য এমন একটি দিনের মেয়াদ নির্ধারিত আছে যার আগমনের ব্যাপারে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্বও করতে পারো না আবার এক মুহূর্ত পূর্বেও তাকে আনতে পারো না।^{৪৭}

নিয়োগ করছো কিনা। এ ব্যাপারে হোচট খেলে তাতে ক্ষতিটা তোমাদেরই হবে, আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

৪৫. এটি এ ব্যাপারে চিন্তা করার প্রেরণা দানকারী শেষ ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি। শ্রোতাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ জীবনে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে হক ও বাতিলের বিরোধ রয়েছে এবং আমাদের দুই দলের মধ্য থেকে কোন একজনই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, এটাই শেষকথা নয় বরং এর পরে এটিও এক অকাটা সত্য যে, আমাদের ও তোমাদের উভয় দলকেই নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে। আর রবও হচ্ছেন এমন যিনি প্রকৃত সত্য অবহিত আছেন এবং আমাদের উভয় দলের অবস্থাও ভালোভাবেই জানেন। সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কারা সত্য ও কারা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়টিরই চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে না বরং এ মামলারও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে যে, তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য আমরা কি করেছি এবং তোমরা মিথ্যাপূজার জ্বিদের বশবর্তী হয়ে কিভাবে আমাদের বিরোধিতা করেছো।

৪৬. অর্থাৎ এ উপাস্যদের ওপর ভরসা করে তোমরা এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথা পেতে নেবার আগে এখানেই আমাকে একটু জানিয়ে দাও, তাদের মধ্যে কে এমন শক্তিশালী আছে যে আল্লাহর আদালতে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে এবং তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে?

৪৭. অর্থাৎ কেবল এ শহর, এ দেশ বা এ যুগের লোকদের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য তোমাকে চিরন্তন নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমার এ সমকালীন স্বদেশীয় লোকেরা তোমার মর্যাদা বুঝে না। কত বড় মহান সন্তাকে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে সে ব্যাপারে কোন অনুভূতিই তাদের নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল তাঁর নিজের দেশ বা যুগের জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, একথা কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে :

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأَتَذْكُرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

“আর আমার প্রতি এ কুরআন অহীর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এ বাণী পৌছে যায় তাকেই সতর্ক করে দেই।”

(আল আন’আম, ১৯৭)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

“হে নবী! বলে দাও, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল।” (আল আ’রাফ, ১৫৮)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“আর হে নবী! আমি পাঠিয়েছি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই রহমত হিসেবে।” (আল আশিয়া, ১০৭)

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যাতে সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হয়।” (আল ফুরকান, ১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন। যেমন :

بعثت الى الاحمر والاسود

“আমাকে সাদা কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।” (মুসনাদে আহমাদ : আবু মূসা আশ’আরী বর্ণিত)

اما انا فارسلت الى الناس كلهم عامة وكان من قبلى انما يرسل الى قومه

“আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমার আগে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁকে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো।” (মুসনাদে আহমাদ : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণিত)

وكان النبی يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

“প্রথমে প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর জাতির কাছে পাঠানো হতো আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ ۖ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا اٰنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُّوْا اَنَحْنُ صَدِّدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ ۚ بَلْ كُنْتُمْ
مُجْرِمِينَ ۝

৪ রুকু'

এ কাফেররা বলে, “আমরা কখনো এ কুরআন মানবো না এবং এর পূর্বে
আগত কোন কিতাবকেও স্বীকার করবো না।” ৫০ হায়! যদি তোমরা দেখো এদের
তখনকার অবস্থা যখন এ জালেমরা নিজেদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে
সময় এরা একে অন্যকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা
হয়েছিল তারা ক্ষমতাগর্বীদেরকে বলবে, “যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমরা
মু’মিন হতাম।” ৫১ ক্ষমতাগর্বীরা সেই দমিত লোকদেরকে জবাবে বলবে,
“তোমাদের কাছে যে সৎপথের দিশা এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে
রুখে দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই তো অপরাধী ছিলে।” ৫২

بعثت انا والساعة كهاتين يعنى اصبعين

“আমার আগমন ও কিয়ামতের অবস্থান এরূপ একথা বলতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দু’টি আঙুল উঠান।” (বুখারী ও মুসলিম)

এর অর্থ এই ছিল যে, “এ দু’টি আঙুলের মাঝখানে যেমন তৃতীয় কোন আঙুলের
অন্তরাল নেই ঠিক তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝখানেও অন্য কোন নবুওয়াতের
অন্তরাল নেই। আমার পরে এখন আর শুধু রয়েছে কিয়ামত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমিই
নবী হিসেবে থাকবো।”

৪৮. অর্থাৎ যে সময় সম্পর্কে তুমি এইমাত্র বললে, “আমাদের রব আমাদের একত্র
করবেন এবং আমাদের মধ্যে যথাযথ ফায়সালা করে দেবেন” সে সময়টি আসবে কবে?
আমাদের ও তোমার মামলা চলছে দীর্ঘকাল থেকে। আমরা বারবার তোমার কথাকে

মিথ্যা বলেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করে আসছি। এখন এর ফায়সালা করা হচ্ছে না কেন?

৪৯. অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। কোন কাজের জন্য তোমরা যে সময় বেঁধে দেবে সে সময়ই সে কাজটি করতে তিনি বাধ্য নন। নিজের কাজ নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামতো তিনি করে থাকেন। তোমরা আল্লাহর পরিকল্পনা কি বুঝবে? তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব জাতি কতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়ায় কাজ করার সুযোগ পাবে, কত ব্যক্তির এবং কত জাতির কি কি ধরনের পরীক্ষা হবে এবং এ দত্তের সমস্ত কাজকর্ম গুটিয়ে নেবার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের সবাইকে হিসেব-নিকেশের উদ্দেশ্যে ডেকে নেবার জন্য কোন সময়টি উপযোগী হবে তোমরা তার কি বুঝবে! আল্লাহরই পরিকল্পনায় এর যে সময়টি নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়ই এ কাজটি হবে। তোমাদের তাগাদার কারণে সেটি এক সেকেণ্ড আগেও আসবে না এবং তোমাদের আবেদন নিবেদনের ফলে তা এক সেকেণ্ড বিলম্বিতও হবে না।

৫০. এখানে আরবের কাকেরদের কথা বলা হয়েছে, যারা কোন আসমানী কিতাবের কথা স্বীকার করতো না।

৫১. অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, যারা আজ দুনিয়ায় নিজেদের নেতা, সরদার, পীর ও শাসকদের অন্ধ অনুসারী এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন উপদেশদাতার কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়, তারাই যখন প্রকৃত সত্য কি ছিল এবং তাদের নেতারা তাদেরকে কি বুঝাচ্ছিল তা স্বচক্ষে দেখবে এবং যখন তারা একথা জানতে পারবে যে, এ নেতাদের অনুসরণ তাদেরকে এ পরিণতির সম্মুখীন করে দিচ্ছে তখন তারা নিজেদের এসব মনীষীদের বিরুদ্ধে মারমুখো হবে এবং চিৎকার করে বলবে, হতভাগার দল! তোমরাই তো আমাদেরকে গোমরাহ করেছো। আমাদের সমস্ত বিপদের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা আমাদের পথভ্রষ্ট না করলে আমরা আল্লাহ ও রসুলের কথা মেনে নিতাম।

৫২. অর্থাৎ তারা বলবে, আমাদের কাছে এমন কোন শক্তি ছিল না যার সাহায্যে আমরা মাত্র গুটিকয় মানুষ তোমাদের মতো কোটি কোটি মানুষকে জোরপূর্বক নিজেদের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারতাম। যদি তোমরা ঈমান আনতে চাইতে তাহলে আমাদের সরদারি, নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের সিংহাসন উল্টে ফেলে দিতে পারতে। আমাদের সেনাদল তো তোমরাই ছিলে। আমাদের শক্তি ও সম্পদের উৎস তো ছিল তোমাদেরই হাতে। তোমরা নজরানা ও ট্যাক্স না দিলে তো আমরা বিত্তহীনই থাকতাম। তোমরা আমাদের হাতে বাইয়াত না করলে আমাদের পীরালী একদিনও চলতো না। তোমরা জিন্দাবাদের প্রোগান না দিলে কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেসও করতো না। তোমরা আমাদের সৈন্য হয়ে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না হলে একজন মানুষের অপরও আমাদের প্রভাব বিস্তৃত হতে পারতো না। এখন একথা মেনে নিচ্ছে না কেন যে, আসলে রসূলগণ তোমাদের সামনে যে পথ পেশ করে ছিলেন তোমরা নিজেরাই তার ওপর চলতে চাচ্ছিলে না? তোমরা ছিলে নিজেদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাস। আর তোমাদের প্রবৃত্তির এ চাহিদা রসূলদের দেখানো তাকওয়ার পরিবর্তে আমাদের এখানেই পূর্ণ হতো। তোমরা হালাল ও হারামের পরোয়া না করে দুনিয়াবী আয়েশ ও আরামের প্রত্যাশী ছিলে এবং আমাদের কাছেই তোমরা তার সন্ধান পাচ্ছিলে। তোমরা এমন সব পীরের সন্ধান

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ
 لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ
 هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ
 إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالُوا نَحْنُ
 أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

সেই দমিত লোকেরা ক্ষমতাগবীদেরকে বলবে, “না, বরং দিবারাত্রের চক্রান্ত ছিল যখন তোমরা আমাদের বলতে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ উপস্থাপন করি।”^{৫৭} শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে তখন মনে মনে পস্তাতে থাকবে এবং আমি এ অস্বীকারকারীদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি প্রতিদান পাবে, এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান কি তাদেরকে দেয়া যেতে পারে?

কখনো এমনটি ঘটেনি যে, আমি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি এবং সেই জনপদের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা একথা বলেনি যে, তোমরা যে বক্তব্য নিয়ে এসেছো আমরা তা মানি না।^{৫৮} তারা সবসময় একথাই বলেছে, আমরা তোমাদের চাইতে বেশী সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী এবং আমরা কখনো শাস্তি পাবো না।^{৫৯} হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব যাকে চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা দান করেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এর প্রকৃত তাৎপর্য জানে না।^{৬০}

ছিলে যারা তোমাদের সব রকমের পাপ কাজ করার ব্যাপক অনুমতি দিতো এবং সামান্য কিছু নজরানা নিয়ে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিতো। তোমরা এমনসব পণ্ডিত ও মৌলবীদের সন্ধানে ফিরছিলে যারা প্রত্যেকটি শিরূক ও বিদ'আত এবং তোমাদের প্রত্যেকটি মনের মতো জিনিসকে প্রকৃত সত্য প্রমাণ করে তোমাদেরকে খুশী ও তোমাদের স্বার্থ উদ্ধার করে দিতো। তোমাদের এমনসব জালিয়াতের

প্রয়োজন ছিল যারা আল্লাহর দীনকে পরিবর্তিত করে তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা অনুযায়ী একটি নতুন দীন তৈরি করে দিতে পারতো। তোমাদের এমন নেতার প্রয়োজন ছিল যারা পরকাল সমৃদ্ধ হোক বা উৎসরে যাক তার পরোয়া না করে যে কোনভাবেই হোক না কেন তোমাদের দুনিয়াবি স্বার্থ উদ্ধার করে দিতে পারলেই যথেষ্ট। তোমাদের এমন সব শাসকের প্রয়োজন ছিল যারা নিজেরাই হবে অসফরিত ও অবিশ্বস্ত এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তোমরা সব রকমের গোনাহ ও অসৎ কাজ করার অবাধ সুযোগ লাভ করবে। এভাবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান সমান লেনদেনের কথা হয়েছিল। এখন তোমরা এ কেমন ভড়ং সৃষ্টি করে চলেছো, যেন তোমরা বড়ই নিরপরাধ এবং আমরা জোর করে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম।

৫৩. অন্যকথায় এ জনতার জবাব হবে, তোমরা এ দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমান অংশীদার করছো কেমন করে? তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা চালবাজী, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার কেমন মোহময় যাদু সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং রাতদিন আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের ফাঁদে আটকাবার জন্য কেমন সব পদক্ষেপ নিয়েছিলে? তোমরা আমাদের সামনে দুনিয়া পেশ করেছিলে এবং আমরা তার জন্য জ্ঞান দিয়ে দিলাম, ব্যাপারতো মাত্র এতটুকুই ছিল না বরং তোমরা রাতদিনের প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে আমাদেরকে বেকুব বানাচ্ছিলে এবং তোমাদের প্রত্যেক শিকারী প্রতিদিন একটি নতুন জাল তৈরি করে নানা ছলচাতুরী ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল, এটাও ছিল বাস্তব ঘটনা।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেতা ও পীরদের এই বিবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন : আ'রাফ, ৩৮-৩৯; ইবরাহীম, ২১; আল কাসাস, ৬৩; আল আহযাব, ৬৬-৬৮; আল মু'মিন, ৪৭-৪৮ এবং হা মীম আস্ সাজদাহ, ২৯ আয়াত।

৫৪. একথা কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আযিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে রুখে দাঁড়াতে সমাজের সচ্ছল শ্রেণী, যারা অর্থ-বিশ্ব, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন : আল আন'আম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮, ৯০; হুদ, ২৭; বনী ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিনুন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮, ৪৬, ৪৭ এবং আয যুখরুফ, ২৩ আয়াত।

৫৫. তাদের যুক্তি ছিল, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহর বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় লোক। তাইতো তিনি আমাদের এমন নিয়ামত দান করেছেন যা থেকে তোমরা বঞ্চিত অথবা কমপক্ষে আমাদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ে। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকতেন, তাহলে আমাদের এ শানশওকত ও অর্থ-বিশ্ব কেনই বা দিলেন : এখন আল্লাহ এখানে তো আমাদের প্রতি অটল অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন আর আখেরাতে আমাদেরকে শান্তি দেবেন, একথা আমরা কেমন করে মেনে নিতে পারি। শান্তি দিলে তাদেরকেই দেবেন যারা এখানে তাঁর অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়েছে।

কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে দুনিয়া পূজারীদের এ বিভ্রান্তির উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন : আল বাকারাহ, ১২৬, ২১২; আত

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ
 آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَفًّا وَلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي
 الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ
 فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٦٠﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
 الرَّازِقِينَ ﴿٦١﴾

৫ রুকু'

তোমাদের এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে; হাঁ, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।^{৫৭} এরাই এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সুউচ্চ ইমারতসমূহে নিশ্চিন্তে-নিরাপদে থাকবে।^{৫৮} যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা শাস্তি ভোগ করবে।

হে নবী! তাদেরকে বলো, “আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান মুক্ত হস্তে রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোপা দেন।^{৫৯} যা কিছু তোমরা ব্যয় করে দাও তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার চেয়ে ভালো রিযিকদাতা।”^{৬০}

তাওবা, ৫৫, ৬৯; হূদ, ৩, ২৭; আর রা'দ, ২৬; আল কাহ্ফ, ৩৪-৪৩; মারযাম, ৭৩-৭৭; তা-হা, ১৩১; আল মু'মিনুন, ৫৫-৬১; আশু শু'আরা, ১১১; আল কাসাস, ৭৬-৮৩; আর রুম, ৯; আল মুন্সাসির, ১১-২৬ এবং আল ফাজর, ১৫-২০ আয়াত।

৫৬. অর্থাৎ দুনিয়ায় রিযিক বন্টনের ব্যবস্থা যে জ্ঞান, কৌশল ও কল্যাণ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা তারা অনুধাবন করে না। ফলে তারা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ যাকে প্রশস্ত রিযিক দান করেন সে তাঁর প্রিয়পাত্র এবং যার রিযিক তিনি সংকীর্ণ করে দেন সে তাঁর গণ্যবের মুখোমুখি হয়েছে। অথচ কোন ব্যক্তি সামান্য চোখ মেলে তাকালে দেখতে পারে, অনেক সময় বড়ই নোংরা ও ভয়ংকর চরিত্রের লোকেরা বিস্তৃত ও সম্পদশালী হয়েছে এবং আয়েশী জীবন যাপন করছে, পক্ষান্তরে অনেক সৎকর্মশীল ও ভদ্রলোক, যাদের চরিত্র গুণ সবার স্বীকৃতি পেয়েছে, তারা আর্থিক অনটনে জীবন যাপন করছে। এখন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে পারে, আল্লাহ এ পাক-পবিত্র চরিত্রের

অধিকারী লোকদেরকে অপছন্দ করেন এবং দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান চরিত্রের লোকদেরকেই ভালোবাসেন?

৫৭. এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টিই সঠিক। এক, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকটবর্তী করার মতো জিনিস নয়। বরং ঈমান ও সৎকাজ মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। দুই, সম্পদ ও সন্তান একমাত্র এমন সংমুখিনের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে, যে নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং নিজের সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও অনুশীলন দান করে তাকে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ও সৎকর্মশীল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

৫৮. এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, তাঁর এ নিয়ামত হবে অবিনশ্বর এবং এর প্রতিদানের ধারাবাহিকতা কোনদিনই ছিন্ন বা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে না। কারণ যে আয়েশ আরামের কখনো খতম হয়ে যাবার আশংকা থাকে, মানুষ পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তা উপভোগ করতে পারে না। এ ব্যাপারে সবসময় ভয় থাকে কি জানি কখন এসব কিছু ছিনিয়ে নেয়া হবে।

৫৯. এ বিষয়টিকে পুনরুজ্জীবিত সহকারে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথার ওপর জোর দেয়া যে, রিযিক কম বেশী হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত, তাঁর সন্তুষ্টির সাথে নয়। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ভালো-মন্দ সব রকমের মানুষ রিযিক লাভ করছে। যারা আল্লাহকে মেনে নিয়েছে তারাও রিযিক পাচ্ছে এবং যারা অস্বীকার করেছে তারাও। প্রচুর রিযিক লাভ রিযিক লাভকারীর আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবার কথা প্রমাণ করে না। আবার অন্যদিকে কম রিযিক লাভ বা রিযিকের অভাব অভাবগ্রস্তের প্রতি আল্লাহর ক্রোধান্বিত হবার আলামত পেশ করে না। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী একজন জালেম এবং বেসমান লোকও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। অথচ জুলুম ও বেসমানী আল্লাহ পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহরই ইচ্ছার অধীনে একজন সত্যপ্রিয় ও ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কষ্ট সহ্য করতে থাকে অথচ আল্লাহ সত্যবাদিতা ও ঈমানদারী পছন্দ করেন। কাজেই বস্তুগত স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনকে যে ব্যক্তি ভালো ও মন্দের মাপকাঠি গণ্য করে সে বিরাট ভুলের শিকার ও পথভ্রষ্ট। আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং এটি অর্জিত হয় এমন সব নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। এ গুণাবলীর সাথে কেউ যদি দুনিয়ার নিয়ামতগুলোও লাভ করে, তাহলে নিসন্দেহে তা হবে আল্লাহর দান এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে আল্লাহর বিদ্রোহী ও নাফরমান বান্দা হয়ে থাকে এবং এ সংগে তাকে দুনিয়ার নিয়ামতও দান করা হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে কঠিন জবাবদিহি ও নিকৃষ্টতম শাস্তি ভোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৬০. রিযিকদাতা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, দাতা এবং এ ধরনের আরো বহু গুণ রয়েছে, যা আসলে আল্লাহরই গুণ কিন্তু রূপক অর্থে বান্দাদের সাথেও সংশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন আমরা এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলি, সে অমুক ব্যক্তির রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অথবা সে এ উপহারটি দিয়েছে। কিংবা সে অমুক জিনিসটি তৈরি করেছে বা উদ্ভাবন করেছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নিজের জন্য 'উত্তম রিযিক দাতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٦٢﴾

আর যেদিন তিনি সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, “এরা কি তোমাদেরকেই পূজা করতো?”^{৬১} তখন তারা জবাব দেবে, “পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়।^{৬২} আসলে এরা আমাদের নয় বরং জিনদের পূজা করতো, এদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি ঈমান এনেছিল।”^{৬৩} (তখন আমি বলবো :) আজ তোমাদের কেউ কারো উপকারও করতে পারবে না অপকারও করতে পারবে না এবং জালেমদেরকে আমি বলে দেবো, এখন আশ্বাদন করো এ জাহান্নামের আযাবের স্বাদ, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করে থাকো যে, তারা রুজি দান করে থাকে তাদের সবার চেয়ে আল্লাহ উত্তম রিযিকদাতা।

৬১. প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে দেব-দেবী মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আসছে। বৃষ্টির দেবতা, বিজ্ঞানীর দেবতা, বায়ুর দেবতা, ধন-সম্পদের দেবী, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসের পৃথক দেবতা বা দেবীর মূর্তি তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরই সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, কিয়ামতের দিন এই ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরাই কি এদের উপাস্য হয়েছিলে? নিছক অবস্থা অনুসন্ধান করা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয় বরং এর মধ্যে এই অর্থও নিহিত রয়েছে যে, তোমরা কি তাদের পূজা-অর্চনায় রাজি ছিলে? কিয়ামতে এ প্রশ্ন কেবল ফেরেশতাদেরকেই করা হবে না বরং দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত ও পূজা করা হয় তাদেরকেও করা হবে। তাই সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে :

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ؕ أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ -

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ
يُصَدَّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مِّبِينٌ
وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ
نَذِيرٍ ۖ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا بَلَغُوا مِيعَادًا ۖ وَآتَيْنَهُمْ
فَكَذَّبُوا أَرْسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝

এদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন এরা বলে, “এ ব্যক্তি তো চায় তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব উপাস্যের পূজা করে এসেছে তাদের থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে।” আর বলে, “এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।” এ কাফেরদের সামনে যখনই সত্য এসেছে তখনই এরা বলে দিয়েছে, “এ তো সুস্পষ্ট যাদু।” অথচ না আমি এদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যা এরা পড়তো, আর না তোমার পূর্বে এদের কাছে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।^{৬৪} এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তার এক-দশমাংশেও এরা পৌঁছতে পারেনি কিন্তু যখন তারা আমার রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো তখন দেখে নাও আমার শাস্তি ছিল কেমন কঠোর।^{৬৫}

“যেদিন আল্লাহ এদেরকে এবং যেসব সন্তার এরা ইবাদাত করতো তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না এরা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল?” (১৭ আয়াত)

৬২. অর্থাৎ তারা জবাব দেবে, অন্য কেউ খোদায়ী ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আপনার সাথে শরীক হবে আপনার সন্তা এ থেকে পাক-পবিত্র এবং এর অনেক অনেক উর্ধে। এ লোকগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এদের এবং এদের কাজ-কারবারের কোন দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর নেই। আমরা তো আপনার বান্দা।

৬৩. এ বাক্যাংশে জিন বলতে জিনদের মধ্যকার শয়তানদের কথা বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতাদের এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, বাহ্যত এরা আমাদের নাম নিয়ে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী আমাদের মূর্তি বানিয়ে যেন আমাদেরই ইবাদাত করতো কিন্তু আসলে আমাদের নয় বরং এরা ইবাদাত করতো শয়তানের। কারণ শয়তানরাই তাদেরকে এ পথ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ
تَتَفَكَّرُونَ ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৬ রুক্ব

হে নবী! এদেরকে বলে দাও, “আমি তোমাদেরকে একটিই উপদেশ দিচ্ছি : আল্লাহর জন্য তোমরা একা একা এবং দু’জন দু’জন মিলে নিজেদের মাথা ঘামাও এবং চিন্তা করো। তোমাদের সাথির মধ্যে এমন কি কথা আছে যাকে প্রলাপ বলা যায়? ৬৬ সেতো একটি কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে। ৬৭ এদেরকে বলো, “যদি আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চেয়ে থাকি তাহলে তা তোমাদের জন্যই থাকুক। ৬৮ আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহরই এবং তিনি সব জিনিসের ওপর সাক্ষী। ৬৯

দেখিয়েছিল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করার এবং তাদের সামনে নজরানা পেশ করার জন্য শয়তানরাই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

যারা জিনদেরকে পার্বত্য এলাকার অধিবাসী এবং গ্রামীণ ও মরু এলাকার মানুষ অর্থে গ্রহণ করেন এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে তাদের সে চিন্তা ভুল বলে প্রমাণিত করে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এ আয়াতটি পড়ে এরূপ ভাবতে পারে যে, লোকেরা পাহাড়ী, মরুচারী ও গ্রামীণ লোকদের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাদের ইবাদাত করতো?

এ আয়াত থেকে ইবাদাতের অন্য একটি অর্থের ওপরও আলোকপাত করা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, ইবাদাত কেবল উপাসনা, আরাধনা ও পূজা-অর্চনারই নাম নয়। বরং কারো নির্দেশে চলা এবং চোখ-কান বন্ধ করে তার আনুগত্য করাও ইবাদাত। এমনকি মানুষ যদি কাউকে অভিশাপ দেয় (যেমন শয়তানদেরকে অভিশাপ দেয়) এবং তারপরও তারই পথ অনুসরণ করে চলে তাহলেও সে তারই ইবাদাত করছে। এর অন্য দৃষ্টান্তগুলোর জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসা, ১৪৫; আল মা-য়েদাহ, ৯১; আত্ তাওবা, ৩১; মারয়াম, ২৭ এবং আল কাসাস, ৮৬ টীকা।

৬৪. অর্থাৎ এর পূর্বে না এমন কোন কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর না এমন কোন রসূল আসেন, যিনি এসে তাদেরকে এমন শিক্ষা দেন, যার ফলে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী ও পূজা করতো। তাই তারা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় পুরোপুরি মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত অস্বীকার করছে। এর সপক্ষে তাদের কাছে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই।

৬৫. অর্থাৎ এ জাতিগুলো যে পরিমাণ শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল মক্কার লোকেরা তার দশ ভাগের একভাগও অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু নবীগণ তাদের সামনে যে সত্য পেশ করেছিলেন তা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল এবং মিথ্যার ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিল। এর ফলে শেষ পর্যন্ত তারা কিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শক্তি ও ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে লাগেনি তা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও।

৬৬. অর্থাৎ স্বার্থ কামনা ও বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে একান্ত আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা করে দেখো। প্রত্যেক সদুদ্দেশ্যে আলাদা আলাদাভাবেও চিন্তা করো আবার দু'জন চারজন মিলে মিশে একসাথে বসেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে পরস্পর বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমে এ মর্মে অনুসন্ধান চালাও যে, গতকাল পর্যন্তও যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করছিলে তাকে আজ কিসের ভিত্তিতে পাগল গণ্য করছো? নবুওয়াত লাভের মাত্র কিছুকাল আগেই তো একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ক'বাঘর পুনরনির্মাণের পর হাজ্জের আসওয়াদ সংস্থাপনের প্রশ্নে কুরাইশের গোত্রগুলো যখন পরস্পর লড়াই করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন তোমরাই তো একযোগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধ মীমাংসাকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং তিনি এমনভাবে তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের সমগ্র জাতি যে ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এখন এরপর এমন কি ঘটনা ঘটে গেলো যার ফলে তোমরা তাকে পাগল বলতে শুরু করেছো? হঠকারিতা ও গোয়াত্মির কথা তো আলাদা কিন্তু সত্যই কি তোমরা মুখে যা বলছো নিজেদের মনেও সেটাকেই সত্য বলে মনে করে থাকো?

৬৭. অর্থাৎ এ অপরাধের ভিত্তিতেই কি তোমরা তাকে মানসিক রোগী বলে গণ্য করছো? তোমাদের মতে বুদ্ধিমান কি এমন ব্যক্তিকেই বলা হবে যে তোমাদের ধ্বংসের পথে যেতে দেখে বলবে, শাবাশ, বড়ই চমৎকার পথে যাচ্ছে এবং পাগল বলা হবে তাকে যে তোমাদেরকে দুঃসময় আসার আগে সতর্ক করে দেবে এবং বিপর্যয়ের পরিবর্তে সংশোধনের পথ বাতলাবে?

৬৮. মূলে বলা হয়েছে : **مَا سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرِ فُؤَادِكُمْ** এর একটি অর্থ আমি ওপরে অনুবাদে বলেছি। এর দ্বিতীয় একটি অর্থ এও হতে পারে, তোমাদের কল্যাণ ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না এবং তোমরা ঠিক হয়ে যাও, এটিই আমার পুরস্কার। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

“হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমাদের কাছ থেকে এ কাজের জন্য এ ছাড়া আর কোন প্রতিদান আমি চাই না যে, যে চায় সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।”

(আল ফুরকান, ৫৭)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِرُ بِالْحَقِّ ۖ عَلَآ الْغُيُوبِ ۝ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

এদেরকে বলো, “আমার রব (আমার প্রতি) সত্যের প্রেরণা দান করেন^{৭০} এবং তিনি সমস্ত গোপন সত্য জানেন।” বলো, “সত্য এসে গেছে এবং এখন মিথ্যা যত চেষ্টাই করুক তাতে কিছু হতে পারে না।” বলো, “যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার শাস্তি আমারই প্রাপ্য আর যদি আমি সঠিক পথে থেকে থাকি, তাহলে তা হবে আমার রব আমার প্রতি যে অহী নাযিল করেন তারই ভিত্তিতে। তিনি সবকিছু শোনে এবং নিকটেই আছেন।^{৭১}”

৬৯. অর্থাৎ অপবাদদাতারা যা ইচ্ছা অপবাদ দিক কিন্তু আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সাক্ষী আছেন, আমি নিস্বার্থ এবং নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি এ কাজ করছি না।

৭০. মূল শব্দ হচ্ছে, يَقْذِرُ بِالْحَقِّ এর একটি অর্থ হচ্ছে, অহীর মাধ্যমে তিনি সত্য জ্ঞান আমাকে দান করেন। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তিনি সত্যকে বিজয়ী করেন এবং মিথ্যার মাথায় সত্যের আঘাত হানেন।

৭১. এ যুগের কোন কোন লোক এ আয়াত থেকে একথা প্রমাণ করেন যে, এর দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথভ্রষ্ট হতে পারতেন বরং হয়ে যেতেন। তাইতো মহান আল্লাহ নিজেই নবী করীমের (সা) মুখে একথা বলে দিয়েছেন যে, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী হবো আমি নিজেই এবং আমি তখনই সঠিক পথে থাকি যখন আমার রব আমার প্রতি অহী (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত) নাযিল করেন। এ ভুল ব্যাখ্যার সাহায্যে এ জ্বালেমরা যেন একথা প্রমাণ করতে চায় যে, নবী করীমের (সা) জীবন ছিল নাউযুবিল্লাহ সঠিক পথে চলা ও ভুল পথে চলার সমাহার এবং মহান আল্লাহ কাকেরদের সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ স্বীকারোক্তি এ জন্য করিয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তি যেন তাঁকে পুরোপুরি সঠিক পথে রয়েছেন মনে করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য না করে বসে। অথচ যে ব্যক্তিই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে চিন্তা করবে সেই বুঝতে পারবে যে, এখানে “যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি” কথাটার অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা) সত্যিসত্যি বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন, বরং পুরো কথাটাই এ অর্থে বলা হয়েছে যে, “যদি আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকি, যেমন তোমরা আমার প্রতি অপবাদ দিচ্ছে এবং আমার এ নবুওয়াতের দাবী এবং আমার এ তাওহীদের দাওয়াত এই বিভ্রান্তিরই ফল, যেমন তোমরা ধারণা করছো, তাহলে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার ওপরই পড়বে, এর দায়ে তোমরা পাকড়াও হবে না। কিন্তু যদি আমি সঠিক পথে থাকি, যেমন যথার্থই আমি আছি, তাহলে তার কারণ হচ্ছে

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَآخِذُ وَمِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ۝۹۱ وَقَالُوا
 آمَنَّا بِهِ ؕ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝۹۲ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ
 مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝۹۳ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ
 وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي
 شَكٍّ مُرِيبٍ ۝۹۴

আহা, যদি তুমি দেখতে তাদেরকে সে সময় যখন তারা ভীত-সঙ্কস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং কোথাও নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারবে না বরং নিকট থেকেই পাকড়াও হয়ে যাবে।^{৭২} সে সময় তারা বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম,^{৭৩} অথচ এখন দূরে চলে যাওয়া জিনিস নাগালের মধ্যে আসতে পারে কেমন করে?^{৭৪} ইতিপূর্বে তারা কুফরী করেছিল এবং আন্দাজে বহুদূর থেকে কথা নিয়ে আসতো।^{৭৫} সে সময় তারা যে জিনিসের আকাংখা করতে থাকবে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমনটি তাদের পূর্বসূরী সমপন্থীরা বঞ্চিত হয়েছিল। তারা বড়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিল।^{৭৬}

এই যে, আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে অহী আসে, যার মাধ্যমে আমি সঠিক পথের জ্ঞান লাভ করেছি। আমার রব কাছেই আছেন। তিনি সবকিছু শুনছেন। আমি পথহারা অথবা তাঁর দিকে যাবার পথের সন্ধান পেয়েছি, তা তিনি জানেন।

৭২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অপরাধী এমনভাবে পাকড়াও হবে যেন মনে হবে পাকড়াওকারী কাছেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। অপরাধী সামান্য একটু পালাবার চেষ্টা করার সাথে সাথেই যেন তাকে ধরে ফেলেছে।

৭৩. অর্থ হচ্ছে, এমন শিক্ষার প্রতি ঈমান আনলাম যা রসূল দুনিয়ায় পেশ করেছিলেন।

৭৪. অর্থাৎ ঈমান আনার জায়গা ছিল দুনিয়া। সেখান থেকে এখন তারা বহুদূরে চলে এসেছে। আখেরাতের জগতে পৌঁছে যাবার পর এখন আর তাওবা করা ও ঈমান আনার সুযোগ কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

৭৫. অর্থাৎ রসূল, রসূলের শিক্ষা এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপবাদ দিতো, বিদূষাত্মক শব্দ উচ্চারণ করতো ও ধ্বনি দিতো। কখনো বলতো, এ ব্যক্তি যাদুকর; কখনো বলতো পাগল। কখনো তাওহীদ নিয়ে ঠাট্টা-বিদূষ করতো আবার কখনো আখেরাতের ধারণাকে উপহাস করতো। কখনো এই মর্মে গল্প তৈরি করতো যে,

রসূলকে অন্য কেউ পড়িয়ে ও শিখিয়ে দেয় আবার কখনো মু'মিনদের ব্যাপারে বলতো, এরা শুধুমাত্র নিজেরদের অজ্ঞতার কারণে রসূলের অনুসারী হয়েছে।

৭৬. আসলে শিরক, নাস্তিক্যবাদ ও আখেরাত অস্বীকার করার বিশ্বাস কোন ব্যক্তি নিশ্চয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করে না এবং করতে পারে না। কারণ নিশ্চয়তা একমাত্র সঠিক জ্ঞান ও জ্ঞানার ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে। আর আল্লাহ নেই অথবা বহু আল্লাহ আছে কিংবা বহু সত্তা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী অথবা পরকাল হওয়া উচিত নয় ইত্যাকার বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই সঠিক জ্ঞান নেই। কাজেই যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় এ আকীদা-বিশ্বাস অবলম্বন করেছে সে নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে একটি ইমারত নির্মাণ করেছে। এ ইমারতের মূল ভিত্তি সন্দেহ-সংশয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ সন্দেহ তাকে নিয়ে গেছে ঘোরতর বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দিকে। আল্লাহর অস্তিত্বে সে সন্দিহান হয়েছে। তাওহীদের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়েছে। আখেরাতের আগমনে সন্দেহ পোষণ করেছে। এমনকি এ সন্দেহকে সে নিশ্চিত বিশ্বাসের মতো মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নবীদের কোন কথা মানেনি এবং নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকালকে একটি ভুল পথে ব্যয় করে দিয়েছে।